ভারি অলঙ্কার পরে। গলায় যে গহনা পরে তাহা দেখিতে কোন কোনটা আমাদের দেশের হারের মত, কোন কোনটা বা তাবিজ সমষ্টির মত। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় শ্যাম দেশীয় স্ত্রীলোকেরা মাথায় বড় চুল রাখা ভাল বাসেন। ওখানকার পুরুষেরা মাথায় সমস্ত চুল কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীলোকেরা মাথা মুড়াইয়া ফেলে না বটে, কিন্তু চুল খাট করিয়া কাটে। এই খাট চুলদ্বারা যেরূপ হইতে পারে সেইরূপ ভাবে তাহারা মাথায় একটা খোপা বাঁধে।

এই দেশের স্ত্রীলোকেরা বেশ শ্রমশীল। যে সকল চাষীলোকে মাঠে কাজ করে, তাহাদিগের স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সহিত কাজ করে। যে পুরুষের যে জাতীয় ব্যবসায়, তাহাদের স্ত্রীলোকেরাও তাহাদের সেই কার্য্যের সহায়তা করে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে শ্যামদেশের বিবরণ পাঠে বোধ হয় শ্যামদেশে স্ত্রীলোকেরা শ্রমরতা, কিন্তু পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত অলস। অনেক পুরুষ আমোদ প্রমোদে দিন কাটায়। কেহ ঘুড়ি উড়ায়, কেহ মাছ ধরে, কেহ বা মাছের খেলা দেখে। সেই দেশে এইরূপ আরও অনেক বিধ আমোদ আছে।

এই দেশের লোকেরা বেশ সভ্য, বিনয়ী ও সদয় কিন্তু নির্ব্বোধ। কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক সকলেরই আদব কায়দা খুব ভাল। যাহার প্রতি যেরূপ সম্মান দেখাইতে হয়, তাহার প্রতি তাহাই সকলে দেখাইয়া থাকে। যেরূপ কথায় লোকে কষ্ট পাইতে পারে তাহারা সেরূপ কথা কখনও বলে না। তাহারা বয়োবৃদ্ধ পুরুষদিগকে পিতার ন্যায় ও বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে মাতার ন্যায় সম্মান করে। বয়ঃকনিষ্ঠ স্ত্রী-পুরুষকে তাহারা কন্যাপুত্রের ন্যায় স্নেহ করে। কেহ কাহারও নিকটে কোন অপরাধ করিলে পরক্ষণেই আত্মদোষ বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করে। একের বিপদ দেখিলে অপরে সাধ্যমত তাহার উপকার করে। এদেশে বিবাদ বিসম্বাদের সংখ্যা অতি অল্প। অনেক পুরুষ ও অনেক স্ত্রীলোক এক পরিবারের মধ্যে বাস করে, অথচ ইহাদের মধ্যে কলহ নাই।

ইহাদের মধ্যে পুরুষেরা একের অধিক বিবাহ করে না। কিন্তু ধনী লোকদের মধ্যে অনেকে অনেকগুলি করিয়া সেবিকা বা দাসী রাখে। ঐ সকল সেবিকারা বাস্তবিক পক্ষে ভার্য্যা হইলেও বিবাহিতা স্ত্রী হইতে আদরণীয়া নহে বলিয়া বোধ হয়। ইহারা বাঁদী বা সেবিকা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পনর হইতে সতের বৎসর পর্য্যন্ত বয়সে প্রায় এই জাতীয় বালিকাদের বিবাহ হয়। কচিৎ কোন কোন প্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাকে, আমাদের দেশের প্রাচীন কালে প্রচলিত গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহিতা হইতে দেখা যায়। অনেক পুরুষকেই পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। যাহারা পণ দিয়া বিবাহ করে, তাহারা ইচ্ছা করিলে আবার স্ত্রী ত্যাগও করিতে পারে। কিন্তু যে

রমণী পিত্রালয় হইতে ভূষণ, যৌতুক ও নগদ টাকা লইয়া আইসে, স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহাকে ত্যাগ বা বিক্রয় করিতে পারে না।

আমাদের দেশে যেমন বর কন্যার রাশি নক্ষত্র ও গণ প্রভৃতি মিলিয়া গেলে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করা হয়, সেইরূপ শ্যামদেশে কন্যার ও বরের জন্ম বৎসরানুসারে তুলনা করিয়া শুভাশুভ বিচার করা হয়। গণক ঐরূপ শুভাশুভ বিচার করিয়া যে বৎসরে জাত কন্যার সহিত যে বৎসরে জাত বরের বিবাহে দোষ নাই বলিয়া দেন সেই বর কন্যারই বিবাহ হইয়া থাকে। পরে জ্যোতির্ব্বিদ আবার বিবাহের শুভলগ্ন স্থির করিয়া দেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যা বরের বাটীতে গেলে, পুরোহিত ধর্ম্মপুস্তক হইতে কতিপয় মন্ত্র পাঠ করিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন। কন্যা যব- নিকার আড়ালে থাকে এবং সেই অবস্থায় ঐরূপ আশীর্ব্বাদ করা হয়। পরে পর্দ্দা তুলিয়া দেওয়া হইলে অন্য লোকে তাহা দের উপর মন্ত্রপূত বারি সিঞ্চন করে। তৎপরে পুরোহিত আবার মন্ত্র পাঠ করেন। এইরূপে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে, আরও দুই দিন ক্রমাগত উৎসব ব্যাপার চলিতে থাকে।

বিবাহ হইয়া গেলে যত দিন প্রথম পুত্রের জন্ম না হয়, ততদিন বর তাহার শ্বশুরালয়ে থাকে। আমাদের দেশে যে রূপ সূতিকা গৃহে সন্তান জন্মে শ্যামদেশেও ঐরূপ ভাবে পৃথক সূতিকা গৃহে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে। ঐ গৃহে আগুণ জালিয়া রাখিতে হয় এবং প্রসূতিকে কিছু দিন ঐ ঘরে থাকিতে হয়।

শ্যাম দেশের শিশুদিগকে এক প্রকার দোলায় করিয়া কখন কখন খেলা করান ও ঘুম পাড়ান হইয়া থাকে। ঐ দোলনা দেখিতে কতকটা টুকরির মত। ঐ দোলনা দড়ি দিয়া ঘরের আড়কাটে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। ছেলেকে ঐরূপ ঝুলাইয়া রাখিয়া মাতা অনেক গৃহকর্ম্ম ও প্রয়ো- জনীয় কার্য্য সারিয়া লয়।

বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার বয়স হইলে পুরোহিতদিগের নিকটে শিক্ষার্থে পাঠান হয়। শ্যামদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে এবং সেই দেশীয় বৌদ্ধ পুরোহিতগণ ছাত্র দিগকে প্রধানতঃ ধর্ম্ম শিক্ষাই দিয়া থাকেন। উক্ত পুরোহিতদিগের বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের যাওয়ার ও শিক্ষা দেও- য়ার নিয়ম নাই। বহু বৎসর হইল শ্যাম দেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আর ও অনেক স্থলে বালিকাবিদ্যালয় হইয়াছে এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

শ্রীঅভিনাশচন্দ্র সার্ব্বভৌম।

তাসের ঘর।

সন্ধ্যার পরে আমি আমার ঘরটীতে চুপ করিয়া বসিয়া আছি, পার্শ্বে আমার পঞ্চম-বর্ষ-বয়স্কা দৌহিত্রী বীণা কতকগুলি তাস লইয়া আপন মনে খেলা করিতেছে। আমি এক এক বার তাহার খেলা দেখিতেছি আবার অন্য মনে কি ভাবিতেছি। আকাশের অবস্থা সেদিন ভাল ছিল না। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল এবং বাতাসও একটু জোরে বহিতেছিল। বহির্জগতের এই অস্বচ্ছন্দতার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, আমার শরীরটা সে দিন বড় ভাল ছিল না। এক পার্শ্বে একটা কেরাসিনের আলো সমুজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে, সম্মুখে অমর-কবি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রহিয়াছে, কিন্তু আমার তখন পুস্তক-পাঠে মন ছিল না, আমি তখন কি ভাবিতেছিলাম কে জানে?

বীণা খেলা করিতে করিতে হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আমার দু'খানি হাত আকর্ষণ করিয়া আব্দারের স্বরে বলিল, "দিদি মা আমায় তাসের ঘর ক'রে দাও।" রাজ্যেশ্বরের আদেশ পালন করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিলে, তাহাতেও মুক্তির সম্ভাবনা আছে, এবং সময় চাহিলেও পাওয়া যায়, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র রাজ্ঞী আমাকে একটুও সময় দিলেন না। কাজেই আমি চিন্তা-সূত্র ছিন্ন করিয়া, তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান হইলাম। আমি নিরতিশয় গাম্ভীর্য্য এবং অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাসের কেল্লা প্রস্তুত করিতে বসিয়া গেলাম।

সার আইজাক নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি আবিষ্কারের সময় বোধ হয় এতদূর মনোযোগী হন নাই। কলম্বস নূতন মহাদেশ আবিষ্কারের জন্য এমন উদ্যোগী হইয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

যা' হউক অনেকক্ষণ ধরিয়া, অনেক কারি-কুরি করিয়া, সুন্দর তাসের ঘর প্রস্তুত করিলাম। বীণা ঘর দেখিয়া বড় আহ্লাদিত হইল, ছোট ছোট হাত দু'খানিতে তালি দিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। হরি! হরি! তাহার সেই আনন্দ-ধ্বনি না থামিতে,—কচি মুখের হাসি টুকু না মিলাইতে তাহার সেই সাধের ঘর ঝুপ করিয়া পড়িয়া গেল, বুঝি হাত তালি দিতে দিতে কেমন করিয়া একটু আঘাত সেই ঘরে লাগিয়াছিল। ক্ষীণ-প্রাণ কেল্লা, সেই কচি হাতের কোমল আঘাতটুকুও সহ্য করিতে পারিল না, তাহার দুর্ব্বল দেহ লইয়া তৎক্ষণাৎ ভূমি-সাৎ হইল। বীণা নিতান্ত বিষণ্ণ ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "ঘর ভেঙ্গে গেছে, তা'র জন্য দুঃখ কি? আমি আবার এখনি ঘর করে দিতেছি।"

আবার তাসের কেল্লা প্রস্তুত হইল, বীণার বিষণ্ণ মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু হায় দুর্দ্দৈব! উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া

হঠাৎ এক ঝট্‌কা বাতাস আসিয়া বীণার ঘর আবার ফেলিয়া দিয়া গেল। শিশু আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না, মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে কোলে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। বীণা আমার বুকের ভিতর ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া রোদনবিজড়িত স্বরে বলিল, "আমার ঘর দুবার দুবার পড়ে গেল কেন দিদিমা ?"

হায়! ক্ষুদ্র শিশুর এ কথায় উত্তর কে দিবে ? এই মায়াময় জগতে এমন কত সাধের ঘর অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গৃহ কর্ত্তার আনন্দ-কোলাহল না থামিতে, অধরের হাসি না ফুরাইতে, ঘোর ঝঞ্ঝা-বায়ু হঠাৎ কত সুখনিকেতন ভাঙ্গিয়া দিতেছে কে তাহার নির্ণয় করে ? এত জগতের নিত্য ঘটনা। কিন্তু হায়! সাজান ঘর পুনঃপুন কেন ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার উত্তর কে দিবে ? আমি বীণাকে কোলে করিয়া নানারূপে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

বীণা কিছুক্ষণ কাঁদিয়া আমার কোলের ভিতরে ঘুমাইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যায় রাখিয়া আবার চিন্তা সাগরে নিমজ্জিত হইলাম।

দয়াময় বিধাতার রাজ্যে এমন অবিচার কেন ? তিনিত অবিবেচক নন। তিনি ত নির্দ্দয় নন, তবে কেন এমন হয় ? মানুষ কত সাধ করিয়া—কত সুখ কল্পনার আনন্দ-বাসা প্রস্তুত করে, কালের এক ফুৎকারে তাহা কোথায় উড়িয়া যায় আর তাহার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। এমন ঘটে কেন ?

হায়! এ জগৎ কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনশীল। আজ যেখানে আনন্দের হাসি, কাল সেখানে বিষাদের কান্না! আজ যেখানে সুধাধবলিত রমণীয় হর্ম্ম্যমালা সগর্ব্বে দণ্ডায়মান আছে, কাল হয়তঃ কালের অপ্রতিহত-গতি-প্রভাবে সে স্থানে বিস্তীর্ণ মরু ধূ ধূ করিতেছে! আজ যে স্থান আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত, আবার হয়তঃ কাল সে স্থান ঘোর শ্মশানে পরিণত—শবমাংসাহারী জীব-সমুদয়ের চীৎকারে পরিপূরিত। হায়! আমাদের এই দুনিয়ার খেলা ঐ তাসের কেল্লার মত, এই আছে, এই নাই, একটী নিশ্বাসের ভর সহে না।

ভাগ্যনিয়তি অখণ্ডনীয়। বিধাতার ইচ্ছার অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তিনি যাহা বিধান করিবেন, তাহা ঘটিবেই। কিন্তু যাহা প্রতিবিধান করিবার ক্ষমতা আছে, নির্ব্বোধ মানব কেন তাহার প্রতিকূল পথে অগ্রসর হয় না ? কেন ইচ্ছা করিয়া অশান্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে ? তাসের ঘর একদিন ভাঙ্গিবেই, কালের নিঃশ্বাস বায়ুতেই হউক, অথবা মানবকৃত অসাবধানতার আঘাতেই হউক। মানব একটু সাবধান হইলে ঘরটি কিছু দিন অভগ্ন অবস্থায় থাকিতে পারে, কিন্তু হায়! এইটাই অধিক পরিতাপের বিষয় যে, যে ঘর কিছু দিন অন্ততঃ অভগ্নভাবে থাকিত, নির্ব্বোধ মানবের

অসাবধানতায় তাহা অচিরাৎ ভূমিসাৎ হয়।

এক ঘর গৃহস্থ কত কল্পনার কুহকে আশার আনন্দে সাধের ঘর বাঁধিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। কোন দুঃখ ক্লেশ নাই, হঠাৎ কি জানি কখন কি ভাবে কাহার অন্তরে একটু অসন্তোষের ছায়া পড়িল। প্রথম হইতে চেষ্টা করিলে অল্লায়াসেই সেই ছায়াটুকু দূরীভূত হইয়া সংসার সুখের হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া, সেই অসন্তোষটুকু হৃদয়ে পুষিয়া অনুকূল বাতাস দিয়া, উত্তরোত্তর তাহাকে বাড়াইতে লাগিল। ইহার ফলে এই হইল, পরস্পরের হৃদয় হিংসা ও দ্বেষে জর্জ্জর হইতে লাগিল। শান্তিদেবী সে বাড়ী হইতে দূরে পলায়ন করিলেন। সেই গৃহ মধ্যে এক জনের অন্ততঃ যদি সহিষ্ণুতা গুণ থাকিত, যদি একজনও একটু ন্যূনতা স্বীকার করিত, তাহা হইলে সেই অশান্তি টুকু বিদূরিত হইয়া সংসারে পুনঃ শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারিত। সংসার সোনার সংসারে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া, সেই সাধের সংসার ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমে শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। এ ঘটনা জগতে বিরল নহে।

একটী গল্প মনে পড়িল, তাহা সংক্ষেপে বলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না।

এক গ্রামে এক ঘর বনিয়াদী গৃহস্থ বাস করিতেন। তাঁহারা খুব ধনী না হইলেও দরিদ্র ছিলেন না। গৃহকর্ত্তার নাম শিবশঙ্কর রায়। তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল। বিষয় সম্পত্তির আয় হইতে দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি বার মাসে যোল পার্ব্বন সমস্তই হইত। ইহা ছাড়া অতিথি সেবা ঠাকুর সেবা, যথা নিয়মে সম্পন্ন হইত। রায় মহাশয় দুঃখী বিপন্ন জনের পরম বন্ধু ছিলেন। কেহ কোন দায় জানাইলে সাধ্যমত তাহার প্রতিকারে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে দুইজন উপযুক্ত হইয়াছিলেন।

জ্যেষ্ঠ প্রবোধ চন্দ্র কলিকাতায় কোন সওদাগরী আফিসে চাকুরী করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। মধ্যম প্রকাশচন্দ্র গ্রাম্য মাইনার স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কনিষ্ঠ প্রতুলচন্দ্র পাঠদশায় আছেন তাঁহার সংসারে কোনরূপ অভাব, দুঃখ, দৈন্য কিছুই ছিল না। লোকে সেই সংসারকে শান্তির সংসার বলিত।

যতদিন বৃদ্ধ রায় মহাশয় জীবিত ছিলেন। ততদিন সে সংসারে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল। কোন নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। দুঃখ ক্লেশের বার্ত্তাও কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু বৃদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রায় পরিবারের অধঃপতন ঘটিতে আরম্ভ হইল। গৃহে যেন শনির দৃষ্টি পড়িল। রায়-গৃহিণী ইতঃপূর্ব্বেই পরলোকে গমন করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সাধের সংসারের অধঃপতন আর তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই।

প্রবোধ চন্দ্র প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন, কাজেই তাঁহার পত্নী একটু গর্ব্বিতা ছিলেন। এতদিন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও শ্বশুরের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই। এখন সময় পাইয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার স্বামী কত কষ্টে বিদেশে থাকিয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন, আর পাঁচ জনে বাড়ী বসিয়া তাই নষ্ট করে, বড় বধূর তাহা সহ্য হইবে কেন? তিনি প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বেশ দু'কথা শুনাইতে লাগিলেন। প্রকাশচন্দ্র ত নিতান্ত মূর্খ নন, একেবারে অক্ষমও নন, তিনি পঁচিশ টাকা বেতনের কার্য্য করেন। ছেলে পড়ানর জন্য উপরিও কিছু উপার্জ্জন আছে। কাজেই তাঁহার স্ত্রী, বড় বধূর তীব্র বাক্য নীরবে সহ্য না করিয়া সমুচিত উত্তর দিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই দাঁড়াইল যে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়া উভয়ে পৃথক হইলেন। প্রবোধ চন্দ্র কলিকাতায় চাকরী করেন, সুতরাং তিনি সপরিবারে কলিকাতায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহাপ্রাণ শিবশঙ্কর রায়ের বিস্তীর্ণ বাস ভবন বিক্রীত হইয়া তুল্যাংশে বিভক্ত হইল। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার নব নির্ম্মিত বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ প্রতুলচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের এই অবজ্ঞ ব্যবহারে মনের দুঃখে কোথায় বিবাগী হইয়া চলিয়া গেলেন। পিতৃ মাতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণ করা সুযোগ্য জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তব্য বোধ করিলেন না। সে সময় তাঁহারা পৈতৃক বিষয়াদি বিভাগের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। হায় স্বার্থ!!

আর কি বলিব? যে বাড়ীতে এক মাতৃস্তন্যে পালিত সহোদর ভ্রাতায় মধ্যে এমন বিসম্বাদ ঘটে, কমলা কি সেখানে স্থিরভাবে থাকিতে পারেন? শীঘ্রই তিনি রায়বাটী হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এক দিন যে চণ্ডীমণ্ডপ গীত বাদ্যের মধুর শব্দে অনুপ্রাণিত ছিল, যে স্থান অতিথিগণের আনন্দ-কোলাহলে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত, সে চণ্ডীমণ্ডপ এখন পথিকপরিত্যক্ত পান্থশালার ন্যায় নীরব, জনহীন এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া চর্ম্মচটিকা, বাদুড় প্রভৃতির আবাসস্থল হইল, এবং কিছু দিনের মধ্যেই শিবশঙ্কর রায়ের সেই রমণীয় নয়নরঞ্জন শান্তিকুটীর ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হইল!!

এই সমস্ত চিন্তা যুগপৎ আমার মনে উদিত হইয়া হৃদয়কে বড় ব্যাকুল করিয়া তুলিল। মধ্যে মধ্যে বীণার সেই অর্দ্ধ-স্ফুটিত রোদনজড়িত কোমল স্বরও কাণে বাজিতে ছিল। "আমার ঘর দু'-বার দু'বার পড়ে গেল কেন?"

নানারূপ চিন্তায় সে রাত্রি আমার ভাল নিদ্রা হইল না।

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।
বারুইপাড়া, খুলনা।

ভূত না মানুষ ?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

চন্দনীর চেষ্টা ও চণ্ডদেবের বাহাদুরী।

বীর নন্দক সাতাজী নামক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক রাজপুতনাভিমুখে রওনা হইলে চন্দনীও তাহার মাতার পরামর্শে দেবদত্তও গোপনে নন্দকের অনুসরণ করিলেন। তিনি অতিশয় সতর্কভাবে নন্দকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। নন্দক যখন দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেন তখন তিনি তাঁহার নন্দক দত্ত বায়ুজী নামক অশ্ব ছুটাইয়া দিতেন, আবার নন্দক দৃষ্টির মধ্যে আসিলেই অশ্বের গতি থামাইয়া ফেলিতেন। এইরূপে তিনি নন্দকের সঙ্গে রাজপুতনা পর্য্যন্ত পঁহুছিলেন এবং তাহার সঙ্গেই পুনরায় পুরমণ্ডলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে নন্দক এই দেবদত্তের অশ্বপদধ্বনিই শ্রুত হইয়াছিলেন।

নন্দক ও দেবদত্ত চলিয়া গেলেন দেখিয়া চন্দনী ও তাহার মাতা দুইজন উপবেশন করিয়া এইরূপে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মাতা। এটা সদাসর্ব্বদা এমন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে কেন?

চন্দনী। (অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন) জানিনা, বোধ হয় নন্দকের তরবারীর আঘাতটা গুরুতর হইয়াছিল তাহা এখনও সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই।

মাতা। ক্ষত তো শুষ্ক হইয়াছে দেখিতেছি।

চন্দনী। তা হোক্, ভিতরে দোষ আছে নিশ্চয়ই।

মাতা। আচ্ছা এক কাজ করিলে কেমন হয়?

চন্দনী। কি কাজ মা? ওকে জব্দ করিবার চেষ্টা?

মাতা। এস আমরা দুই জনে একত্র হইয়া ওকে একটু জব্দ করি।

চন্দনী। একটু কেন? ভাল করেই করি না কেন? নন্দকতো আর কাছে নাই।

মাতা। বেশ কথা আমিও ইহাই ভাবিতেছি। তবে তুই এক কাজ কর্।

চন্দনী। কি কাজ?

মাতা। তুই মনোহর সাজে সজ্জিতা হ'।

চন্দনী। কেন? এ দেহে আর সাজের দরকার কি মা আমি যে পতিতা। হটাৎ চন্দনীর নেত্র পল্লব অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল।

মাতা। মনোহর সাজে সজ্জিত হইয়া তোমাকে উহার নিকটে যাইতে হইবে।

চন্দনী। কেন?

মাতা। যাইয়া প্রস্তাব কর যে সে তোমাকে বিবাহ করে। তাহাকে

চেষ্টা কর যে সে তোমাকে বিবাহ করিতে দায়ী, কারণ সে তোমাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছে এবং তুমিও তাহার জন্য লালাইতা।

চন্দনী। লালায়িতা? ইহা হইতে মিথ্যা কথা যে আর সম্ভবে না।

মাতা। ইহা খুবই সত্য কিন্তু এখানে তোমাকে মিথ্যারই অবতারণা করিতে হইবে।

চন্দনী। আচ্ছা করিব, কিন্তু ইহাতে কি ফল পাইব তাহা আমাকে বুঝাও।

মাতা। ইহাতে অপরাধির খোঁজ পাইবে।

চন্দনী। কি প্রকারে?

মাতা। সে তোমাকে বিবাহ করিবার জন্য যদি লালায়িত হয় এবং বিবাহ কথাটা যদি স্বীকার করে, তবে এমন কি পূর্ব্বের অপরাধও স্বীকার করিয়া তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতে পারে।

চন্দনী। করুক্ তাহাতেই বা কি বুঝিবে?

মাতা। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে এই ব্যক্তিই অনিষ্টকারী। এমন কি ভাব দেখাইয়া তুমি তাহার নিকট হইতে প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীর খোঁজ ও বাহির করিয়া লইতে পার।

চন্দনী। ছি মা আমি তাহা পার্ব্ব না।

মাতা। তোমাকে ইহা করিতেই হইবে, দেখিবে নন্দকের অগ্রেই তুমি কৃতকার্য্য হইবে।

চন্দনী। আচ্ছা আমি ইহা করিব। হাব ভাব দেখাইয়া মূঢ়কে মুগ্ধ করিয়া প্রকৃত কথা বাহির করিয়া লইব। একবার সে মহা ভয়ে অস্থির হইয়া বলিয়াছিল "রাজ," কিন্তু সে কথার অনেক অর্থ হয়।

মাতা। হাঁ তাহা পারিবে, অতি সতর্ক হইয়া তাহার নিকট যাতায়াত কর, দেখিবে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। নন্দক এ তাবৎ কাল কপাল ঘামাইয়া যাহা করিতে পারে নাই তুমি তাহা অতি অল্প দিনেই তাহা সাধন করিবে।

চন্দনী। হাঁ, আমি সবই বুঝিতে পারিয়াছি, আমি পারিব, নিশ্চয় পারিব, কিন্তু তুমি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গিয়া সেই কক্ষের বাহিরে দণ্ডায়মানা রহ, পাষণ্ড যদি বল প্রয়োগ করে তুমিও করিও।

মাতা কন্যাকে মনোহর সাজে সজ্জিতা করিয়া কৃত্রিম অভিসারে প্রেরণ করিলেন।

রজনী যখন ত্রিযামা চণ্ডদেবের তখন যেন কাহার স্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইল। চণ্ডদেব চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই রহিল কিন্তু তাহার বুঝিবার বাকি রহিল না যে কে এক জন আসিয়া তাহার শয্যার উপর উপবেশন করিল। এইরূপ বুঝিতে পারিয়া ভীত ও চকিত চণ্ডদেব শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া শয্যার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

যে আসিয়াছিল সে কহিল একবার চক্ষুই মেলনা।

একি, এ যে রমণীর কণ্ঠস্বর। শুধু তাহাই নহে এস্বর যে চণ্ডদেবের পরি-

চিত. এ যে চন্দনীর কণ্ঠস্বর। চণ্ডদেব সাহসে নির্ভয় করিয়া দেখিল চন্দনী সুবেশ ধারণ পূর্ব্বক তাহার সম্মুখে উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে।

চণ্ডদেব চন্দনীকে তদবস্থায় অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল কিন্তু কোন কথা কহিল না।

চন্দনী কহিল এর মধ্যেই বিস্মৃতি এসে উপস্থিত হয়েছে দেখ্‌ছি?

চণ্ডদেবের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল যে চণ্ডদেব যেন এ কথার কিছুমাত্র বুঝিতে পারিতেছে না।

চন্দনী কহিলেন "ধূর্ত্ত চূড়ামণি এখনও ধূর্ত্তমি ত্যাগ কর। উঠিয়া বস তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। একটি প্রার্থনাও আছে তোমাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে।" চণ্ডদেব কথা কহিল না, তাহার চক্ষুতে মুখে যেন বিস্ময়ের ভাবই প্রকাশ পাইতেছিল।

চন্দনী পুনরায় কহিল "পূর্ণ করিবে না?" চন্দনীর স্বরে প্রেমের ভাব জড়িত ছিল। তথাপি চণ্ডদেবকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দনী কহিল "চণ্ডদেব! তুমি আমাকে বিবাহ কর, আমি তোমাকে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, বিশেষ তুমি আমাকে বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ দায়ী। এ কথার তাৎপর্য্য তুমি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখ বুঝিতে পারিবে।"

চণ্ডদেব নীরব হইয়া রহিল। চন্দনী কহিতে লাগিল, "চণ্ডদেব তুমি আমাকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়াছ, এখন আমাকে বিবাহ করিয়া লোকলজ্জা হইতে আমাকে উদ্ধার কর।"

চন্দনী দেখিল তাহার কথা শ্রবণ করিয়া চণ্ডদেব যেন লজ্জা ও ঘৃণায় জড়বৎ হইয়া যাইতেছে।

চন্দনী আবার কহিতে লাগিল "যখন তুমি আমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে তখন আমি তোমাকে ঘৃণা করিতাম, কিন্তু এখন আমি তোমাকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছি, তুমি আমাকে বিবাহ কর।"

চণ্ডদেব কোন কথা কহিল না। চন্দনী দেখিল চণ্ডদেবের মুখ [illegible] যেন মৃত ব্যক্তির ন্যায় সাদা হইয়া উঠিতেছে।

চন্দনী তখন কহিল "তুমি আমাকে প্রতারণা করিও না, প্রতিধ্বনি ও ভাবময়ীকে ভুলিয়া আমাকে গ্রহণ কর। চণ্ডদেব! আমি তোমার হইব। চন্দনীর চক্ষুতে জল ঝরিতে লাগিল। কারণ দুঃখ, ব্যথা ও ঘৃণা তাহাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে ছিল। চণ্ডদেব কথা ত কহিলই না উপরন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া স্থির হইয়া রহিল। চন্দনী কহিল "আমাকে ভুলিও না, আমার নিকট কিছু গোপনও করিও না, আমাকে বিশ্বাস কর, চণ্ডদেব! আমি তোমার।" মুদ্রিত নেত্রে চণ্ডদেব দেখিল না যে এই কথা বলিতেই চন্দনীর ললাটের প্রত্যেক শিরা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডদেব স্থানুবৎ অচল ও মূকবৎ নীরব। চন্দনী কহিল "আমার নিকট ব্যক্ত কর তাহারা দুইজন কোথায় আছে? আমি তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আপনার পথ মুক্ত

করিব, তাহারা বর্ত্তমানে তুমি আমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না।" চণ্ডদেব চন্দনীর কথায় কোন উত্তর দিল না।

চন্দনী দেখিল এখানে আর বসিয়া থাকিয়া কোন ফল নাই। চণ্ডদেব সম্পূর্ণ বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে। অতএব এ উপায়ে কৃতকার্য্য হইবার কোন আশা নাই। এই ভাবিয়া চন্দনী সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার মা দেওয়ালের অন্তরালেই লুক্কায়িতা ছিলেন। কন্যার সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়া মাতা স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক এইরূপ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মাতা। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে তুমি নীরব নিশীথে একাকিনী তাহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রেমালাপ করিয়াও তাহার মন গলাইতে পারিলে না?

চন্দনী। কি আর করব? চেষ্টার ত্রুটী করি নাই ত?

মাতা। সে আমাদের পরামর্শের বিষয় জানিতে পারিয়াছে।

চন্দনী। আশ্চর্য্য।

মাতা। আশ্চর্য্য কি? স্মরণ করিয়া দেখ, তুমি প্রতিধ্বনির ঘরে রাত্রিতে অন্ধকারে লুকাইয়া অনুচ্চস্বরে তাহার বিরুদ্ধে যে কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলে, সে এ বাড়ীতে থাকিয়া কেমন করিয়া তাহা শুনিল? তাহার যে সকল কর্ম্মচারী প্রতিধ্বনিকে লইতে আসিয়াছিল তাহারাও ত সেই স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছিল।

চন্দনী নীরব রহিল।

মাতা। ফলতঃ সে কেমন করিয়া সে কথা শুনিয়াছিল এবং তোমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল?

চন্দনী। হাঁ বুঝিলাম তাহার অসাধ্য কর্ম্ম পৃথিবীর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সে আমাদের পরামর্শের বিষয় কোন রূপে জ্ঞাত হইয়াছে। যাক্ সে কথা, আর একদিন চেষ্টা করিয়া দেখি কি করিতে পারে।

তাহার পর দিবস সন্ধ্যা হইতেই একটু অধিক গ্রীষ্মানুভব হইতেছিল, তাহাতে অনেকেই ভাবিয়াছিলেন, বৃষ্টি হইবে। চণ্ডদেবের শয়ন কক্ষের দরজা জানালা সমুদয়ই মুক্ত ছিল। সে শয্যার উপরে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিল। তখন রজনী দ্বিযামা। চন্দনী ধীরে ধীরে চণ্ডদেবের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। চণ্ডদেবের ঘরে জ্যোৎস্নার সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহার চক্ষুতে, মুখে, শয্যার উপাধানে, অধরে, কেশগুচ্ছে, গণ্ডগ্রীবায় ও বক্ষে পড়িয়াছিল। চণ্ডদেব যেন সরোবরের মধ্যে শারদীয় পদ্ম বা কহ্লারবৎ শোভা পাইতেছিল। চন্দনী চণ্ডদেবের নিকটে আসিয়া যতদূর অস্থির হইবে ভাবিয়াছিল কার্য্যকালে সে তত অস্থির হইল না। চণ্ডদেবের নিকটে বসিয়া অনিমেষ লোচনে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ঘৃণা অথবা ক্রোধ তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিল না। চণ্ডদেব বয়সে যৌবন সীমা অতি-

ক্ষয় করিয়াছে কিন্তু যৌবনের রূপ লাবণ্য তাহাকে ত্যাগ করে নাই। চন্দনী দেখিতে লাগিল যেন দ্বাবিংশ বৎসরের একটী যুবা পুরুষ কতিপয় মল্লিকা মালিকা শুভ্র বিছানার পতিত রহিয়াছে। চন্দনী চণ্ডদেবকে অনেক বার দেখিয়াছে কিন্তু চণ্ডদেবের রূপে যে তত মধুরতা আছে তাহা সে একবারও দেখে নাই। চণ্ডদেব তাহার শত্রু। চণ্ডদেবই তাহাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছে। চন্দনী জানিয়াছে, চণ্ডদেব অধার্ম্মিক, অধম, অধমাধম। যাহার বাতাসে চন্দনী চৈতন্য-হীন হইয়া পড়ে সেই চণ্ডদেবকে দেখিয়া আজ তাহার প্রাণ জুড়াইল কেন? যাহাকে দেখিলে চন্দনীর চক্ষু মুদিয়া পলাইবার সাধ হইত আজ তাহাকেই দেখিতে তাহার এত বাসনা হইল কেন? চন্দনী স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, চণ্ড-দেবকে ডাকিতেও তাহার সাহস হইল না। সে ভাবিতে লাগিল তাই নন্দকের কথাই কি তবে ঠিক? চণ্ডদেব কি সত্যসত্যই নির্দ্দোষী ও সত্যবাদী? চণ্ড-দেবের রূপ ধরিয়া অন্য কেহ কি আমার অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। আহা তাহাই যদি সত্য হইত! চন্দনীর অশ্রুজল তাহার গণ্ডগ্রীবায় গড়াইয়া পড়িল। সে অঞ্চলদ্বারা আপন চক্ষুর জল মুছিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল :—"দেব"

চণ্ডদেব চক্ষুও মেলিল না কথাও কহিল না।

চন্দনী কহিল :—চণ্ডদেব! চক্ষু মেলিয়া তাকাও। ভয় নাই, আমি চন্দনী, যদি তোমার ভ্রান্তি হইয়া থাকে তবে সেই ভ্রান্তি দূর কর।

চণ্ডদেব তথাপি কথা কহিল না।

চন্দনী। চণ্ডদেব আমি চন্দনী। যাহাকে তুমি অকৃত্রিম স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছিলে, আমি সেই চন্দনী। আমার সহিত কথা কও। ভগিনীর সহিত কথা কহিতে লজ্জা কিসের?

চণ্ডদেব কোন কথা কহিল না। তাহার শরীরের কোন অঙ্গও কম্পিত হইল না। সে নিদ্রিত কি জাগ্রত তাহাও অনুভব করা গেল না। চন্দনী বিস্মিতা ও চকিতা হইয়া কম্পিতা হইতে লাগিল। তাহার সুমোহন কবরী খসিয়া পড়িল, সুবাসিত অঞ্চল স্খলিত হইল। সে ভাবিতে লাগিল, এত ধৈর্য্য! মানুষের কি এত ধৈর্য্য সম্ভবে? চণ্ডদেব কি দেবতা? না ইহা আমারই ভ্রান্তি। যাহার বিপক্ষে শত শত প্রমাণ রহিয়াছে তাহাকে দেবতা ভাবিয়া আমি কি নির্ব্বোধ প্রতিপন্ন হই-লাম না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চন্দনী ভাবনায় অতিশয় ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। সে ডাকিতে লাগিল, "চণ্ডদেব! চণ্ডদেব! চণ্ডদেব!"

চণ্ডদেব নীরব, নিস্পন্দ। চন্দনী সেখানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল। তাহার মাতা অদূরেই তাহার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি চন্দনীকে দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস"। তখন

মা ও মেয়ে উভয়ে একত্র হইয়া স্থানান্তরে গমনপূর্ব্বক এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

চন্দনী। এত ধৈর্য্য মানুষের কি সম্ভবে, মা ?

মাতা। ভূতের সম্ভবে।

চন্দনী। মানবেরা ধৈর্য্যশীল ও ক্ষমাশীলকেই দেবতা বলিয়া থাকেন।

মাতা। দেবতা! চণ্ডদেব কি তবে দেবতা? তুমি বল কি? তোমার প্রকৃতি স্থির আছে ত? উন্মাদ গ্রস্ত হও নাই ত?

চন্দনী। চণ্ডদেবের ধৈর্য্য আমাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। ধৈর্য্যেরও ত সীমা আছে?

মাতা। তুমি আবার যাও। অধরে অধর রাখিয়া তাহাকে চুম্বন কর। দেখিব পিশাচের কত ধৈর্য্য। কোন পৈশাচিক শক্তির বলেই সে এরূপ করিতেছে।

চন্দনী। হাঁ তাহাই হইবে। এই বলিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া অনুচ্চস্বরে গাহিল

মরণের পরপারে
আছে এক অপূর্ব্ব নগর
মরণের পরে সেথা
অমর হইবে নারী নর।
হেম ফুল ফুটে সেথা
হেম শাখে হেম পাখী গায়,
দেহ-মুক্ত আত্মা সব
হেথা আসি চির শান্তি পায়।

পরদিন সন্ধ্যা হইতেই চন্দনী সুমোহন সজ্জায় সজ্জিত হইতে লাগিল। আজ সে চণ্ডদেবকে বিচলিত না করিয়া ফিরিবে না। ইহাই তাহার মাতৃ আজ্ঞা। চণ্ডদেব ঘরের সমুদয় দরজা বন্ধ করিয়া শয্যার উপর শুইয়া সময় সময় এইরূপ গাইতেছিল, কিন্তু তাহার জানালাগুলি সমুদয় খোলা ছিল।

আমিত তোমারে আসিতে বলি না
তুমি কেন কাছে এস,
আমিত তোমারে ভাল বাসি না
তুমি কেন ভাল বাস?
আমি চাহিনা প্রেম চাহিনা পুণ্য
আপনি যাচিয়া দাও,
লক্ষিত পাপের প্রলেপটী মম
যতনে মুছিয়া নাও।
আপনি সাধিয়া দিতেছ সকলি
তথাপি ও সরবদা,
দেহ দেহ করি তুলি কোলাহল
ভঙ্গ করি পবিত্রতা।
ধনে জনে ধনী করেছ দীনেরে
তবুও কাঙ্গাল সম,
অতৃপ্তি অশান্তি জ্বলিছে হৃদয়ে
অহো কি নিয়তি মম।

চন্দনী কাঠের জানালা ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য দিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। "কে ও বলিয়া" চণ্ডদেব উঠিতেছিল। সামনে সুমোহনবেশ চন্দনীকে দর্শন করিয়া শয্যার উপরে নিদ্রিতের ন্যায় শুইয়া রহিল।

মুক্ত জানালা পথে জ্যোৎস্নার সঙ্গে সঙ্গে সুরভিত বায়ুর ঢেউও খেলিতেছিল। চন্দনী চন্দন বিলেপিত বাহু উত্তোলন-

পূর্ব্বক চণ্ডদেবের হস্ত ধারণ করিয়া মধুর কণ্ঠে ডাকিল, "দেবতা! একবার উঠিয়া আমার সহিত বাক্যালাপ কর," এবং অনিমেষ লোচনে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিল। চণ্ডদেব অটল অচল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ভালরূপে চলাচল করিতেছিল কি না তাহাও বুঝা যাইতে ছিল না। চন্দনী ভাবিতে লাগিল ইহার অর্থ কি? এই মানুষ গান গাইতেছিল, এই উঠিয়া বসিল, আবার আমাকে দেখিয়া শুইয়া পড়িল, সেই মানুষ এক মুহূর্ত্ত ও অতীত না হইতেই মৃতবৎ। সে নিদ্রিত কি জাগরিত তাহাও বুঝা যাইতেছে না। এ কি? এ কি কোন পৈশাচিক বল না দৈবশক্তি না অত্যধিক ভয়? ভয়ই বা কিসের? বুঝিতে পারি না। সে, বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্ব্বতে, ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, চন্দনীকে দেখিয়া তাহার ভয়ই বা কিসের? এ ভয় কি পাপের ভয়? বারাঙ্গনাকে দেখিয়া সাধু পুরুষেরা ভয় পান। এ ভয় কি সেই ভয়? কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অধিক অত্যাচার করিতেও তাহার সাহস অথবা ইচ্ছা হইল না। অত্যাচার করিলেও যে কোন সুফল পাওয়া যাইবে তাহার আভাসও সে পাইল না। অতএব চণ্ডদেবকে দেখিতে দেখিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী গুপ্তা।

চরিত্রের মাধুর্য্য।

গোলাপটী গাছে ফুটিয়া রহিয়াছে। গন্ধে চারিদিক আমোদিত। গোলাপের সৌন্দর্য্য ও কম নহে। রূপ ও গুণে গোলাপ সর্ব্বজনের আদৃত। যেই গোলাপটী হাতে নিতেছে, সেই বলিতেছে আহা ফুলটি কি সুন্দর। আহা ইহার ঘ্রাণ কি মধুর। গোলাপের মান আছে কি না জানি না। গোলাপ আত্মপ্রশংসা বুঝিতে পারে কি না তাহা ও জানি না। গোলাপ অচেতন জড়, এই সিদ্ধান্তে লোকে বলিয়া থাকে গোলাপের আত্মজ্ঞান কি পদার্থজ্ঞান কিছুই নাই। আমাদের এই সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা কে বলিবে, যদি গোলাপ জন্ম লইয়া, সেই স্মৃতি লইয়া আবার মানব জন্ম লইতে পারিতাম তাহা হইলে কথঞ্চিৎ বলিতে পারিতাম গোলাপ অচেতন না সচেতন। সে যাহা হউক সে বিষয়ের আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আবহমান সংস্কার হইতে ধরিয়া লই যে গোলাপের আত্মজ্ঞান নাই এবং সে যে মানবদিগকে এত আনন্দ দিতেছে তদ্বিষয়ে তাহার চৈতন্য নাই। তাহার যে এত রূপ ও গুণ আছে তাহাও সে বুঝে না, কেহ বলিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন না। এইত জান। গোলাপের রূপ ও গুণের জ্ঞান থাকিলে বোধ হয় গোলাপ একটু স্ফীত

হইত, স্বভাব সুলভ গর্ব্ব আসিয়া তাহার মাথাটা একটু ঘুরাইয়া দিত, গোলাপের পক্ষে তাহা হয় নাই। কিন্তু মানুষ জ্ঞান চৈতন্য লাভ করিয়া যেমন বিমল আনন্দের অধিকারী হইয়াছে তেমন সঙ্গে সঙ্গে আত্মাভিমান ও গর্ব্ব আসিয়া তাহার সেই পূর্ব্ব আনন্দ ভোগের একটু ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। যে পুরুষ এবং মহিলা গোলাপের ন্যায় রূপে গুণে বিভূষিত হইয়াও অবিচলিত থাকিতে পারেন তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই প্রকৃত আনন্দ সম্ভোগ করিতে পারেন। গোলাপের রূপ কিংবা গন্ধ স্বোপার্জ্জিত জিনিষ নহে। সে স্বভাব হইতে তাহা পাইয়াছে। যদি কোন কর্ত্তা কর্ত্তৃক ইহা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা হইলেও সে কর্ত্তা গোলাপের অতীত স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সুতরাং গোলাপের যাহা আছে তাহা কিছুই নিজের বলিবার অধিকার নাই। মানুষের যদি ঠিক তাহাই হইত তাহা হইলে মানুষও হয়ত গোলাপের মত নিরভিমানী ও নিরহঙ্কারী হইতে পারিত। কিন্তু মানুষ মনে করে যে তাহার গুণের কতকটা তাহার স্বোপার্জ্জিত (acquired)। রূপ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা অন্য রূপ হইলেও তজ্জন্য কেহ কেহ গর্ব্বিত হইতে বিরত হয় না। মানুষের রূপ ও গুণ সকলই গোলাপের ন্যায় ভগবদ্দত্ত কি না তদ্বিষয়ে মীমাংসা করা কঠিন। এতদ্বিষয়ে মতের স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা বলেন আমাদের রূপ ও গুণের কতকটা স্বোপার্জ্জিত (acquired), কতকটা পুরুষানুক্রমিক (hereditary), কতকটা স্বাভাবিক (natural)। অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা বলেন যে, যাহাকে স্বোপার্জ্জিত বলা হয় তাহাও পুরুষানুক্রমিক এবং স্বাভাবিকের ন্যায় ব্যক্তিত্ব নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন কর্ত্তার যত্ন দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যাহাকে আমরা যত্ন সম্ভূত সাধনার ফল বলি তাহা বাস্তবিক কতগুলি অপর লক্ষিত শক্তির ক্রিয়ার ফল। সেই শক্তি কমাইবার উপর মানবের কোন হাত নাই। এ গুঢ় রহস্য ভেদ করা সহজ নহে। যাক, বর্ত্তমান প্রবন্ধের তাহা লক্ষ্য নহে। তবে যে সকল গুণ মানবের স্বোপার্জ্জিত বলিয়া বিশ্বাস, সেই সকল গুণ সম্বন্ধে তাহার স্বভাবতঃ গর্ব্ব আসিতে পারে। "আমি যাহা করিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যদি দশ জনে আমাকে প্রশংসা করে তাহা হইলে আমি স্ফীত হইব না কেন? এই রূপ আত্মপ্রসাদে আমাকে তদ্রূপ কার্য্য করিবার জন্য আরও প্রোৎসাহিত করে। সুতরাং আত্মপ্রসাদের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। আত্মপ্রসাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও গর্ব্বের স্থান কোথায়? অন্যের সহিত নিজকে তুলনা করিয়া যখন নিজের একটু শ্রেষ্ঠত্বের জ্ঞান হয় তখনই গর্ব্ব আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। আমি যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি বলিয়া মনে করি তজ্জন্য চিত্তে একটু আনন্দ আসিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি

সেই স্বোপার্জ্জিত গুণের সহিত অন্যের গুণের তুলনা করিব কেন? বরং আমি যদি গোলাপের মত কেবল ফুটিয়া থাকিতে পারি তাহাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। সকলে আমার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হউক, সকলে আমার গুণের সৌরভে পুলকিত হউক। আমি গোলাপের মত অচেতন জড় হইয়া থাকি একটুকুও যেন বিচলিত না হই। তাহাই আমার মনুষ্যত্ব, তাহাকে দেবতা বলিতে চাও ক্ষতি নাই, আমি সেই দেবত্বই চাই। যদি বল গোলাপের মত জড় অচেতন হইলে লাভ কি? আমি বলি এস্থলে গোলাপের সহিত একটু স্বাতন্ত্র্য রহিল। গোলাপ জানেনা তাহার কি আছে, কি নাই। যে স্বভাবের নিয়মে ফুটিয়া রহিয়াছে স্বভাবের নিয়মে সকলের সেবা করিতেছে। আমার কিন্তু সেরূপ নাই, আমি আপনি ফুটিয়াছি, আপনি ভাই ভগিনীদের সেবা করিতেছি। স্বভাব লইয়া আমার যতটুকু সম্বন্ধ তাহার কথা বলিয়া আমাকে লইয়া আমার যতটুকু সম্বন্ধ সে গুণ ও সে রূপের কথা বলিতেছি। আমি যতটুকু ফুটিয়াছি এবং যতটুকু সেবা করিতেছি তজ্জন্য নিজের কৃতিত্ব মনে না করিয়া আমি যাহার তাঁহার কৃতিত্ব মনে করিলেই গর্ব্ব স্থান পাইবে না। আমি গোলাপের মত নিস্তব্ধ নিষ্ফল থাকিতে পারিব।

শ্রীচণ্ডী কিশোর কুমারী।

শিখগ্রন্থ সুখমণি সাহিব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

শরীর কটাই হোমৈ করি রাড়ী।
বরত নেম করৈ বহু ভাতী ॥
নহী তুলি রাম বীচার।
নানক গুরু মুখি নাম জপিয়ৈ ইকবার ॥১

শরীরকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া তাহার দ্বারা হোম করা, অনেক প্রকার ব্রত নিয়ম করা, এ সকলকে রাম নামের সমান বলিয়া কখনও বিচার করিওনা। নানক বলিতেছেন, যদি শিষ্য একবার মাত্র নাম জপ করে; তাহা হইলেই এ সকল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গতি লাভ করে।

নব খণ্ড পৃথিবী ফিরৈ চিরজীবৈ।
মহা উদাস তপীসরুথী রৈ ॥
অগনি মাহি হোম তপ রাখি।
কনিক অশ্ব হৈবর ভূমি দান ॥
ন্যোলী কর্ম্ম করৈ বহু আসন।
জৈন মারগ সংযম অতি সাধন ॥
নিমখ নিমখ করি শরীর কটাবৈ।
তৌভি হৈমৈ মৈলুন যাবৈ ॥
হরিকে নাম সমসরি কছু নাহি।
নানক গুরুমুখি নাম জপত গতি পাহি ॥২

নব খণ্ড যুক্ত পৃথিবী ঘুরিলেও এবং চির জীবন লাভ করিলেও মহা উদাসী

এবং তপস্বী হইলেও, শরীরকে অগ্নিমধ্যে হোম করিলেও, স্বর্ণ, অশ্ব, হস্তি এবং ভূমি দান করিলেও, যোগ কর্ম্ম এবং বহু আসন দান করিলেও, জৈন মার্গে কঠোর সংযম করিলেও, চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া শরীরকে খণ্ড খণ্ড করাইলেও, তথাপি অহঙ্কারের মলা যায় না। হরি নামের সমান কিছুই নহে। নানক বলিতেছেন, শিষ্য হরি নাম জপ করিলে গতি পাইবে ॥২

মন কামনা তীরথ দেহ ছুটৈ।
গর্ব্ব গুমান ন মনতে হুটৈ॥
শোচ করৈ দিনসু অরু রাতি।
মনকী মৈলুন তনতে যাতি॥
ইসু দেহী কো বহু সাধনা করৈ।
মনতে কবহুঁ ন বিখা টরৈ॥
জল ধোবৈ বহু দেহ অনীতি।
শুদ্ধ কহা হোই কাচী ভীতি॥
মন হরিকে নামকী মহিমা উচ।
নানক নামি উধরে পতিত বহু মূঢ় ॥৩

তীর্থে গমন করিলে মনের বাসনা দূর হয় না, মনের গর্ব্ব এবং অহঙ্কার দূর হয় না। দিন রাত কেন শৌচ কার্য্য কর না, তথাপি মনের ময়লা শরীর হইতে যায় না। এই শরীরে অনেক প্রকার সাধনা কর না কেন, মন হইতে কিছুতেই বিষয় দূর হয় না। জল দ্বারা ধৌত কর তত্রাপি শরীরে অনেক দুর্নীতি থাকে। কাঁচা ইটের গাঁথুনিতে কি কখন পাকা গাঁথুনী হয়? মন হরি নামের মহিমাতেই উচ্চ হয়, নানক বলিতেছেন, অসংখ্য পতিত ব্যক্তি ভগবানের নামে উদ্ধার পায় ॥৩

বহুত সিয়া পণ যমকা তৌ বাটৈপ।
অনেক যত্ন করি তৃষ্ণা না ধ্রাপৈ॥
ভেষ অনেক অগনি নহীঁ বুঝৈথ।
কোটি উপর দরগহ নহীঁ সিঝৈথ॥
মোহ খিয়াবৈ মায়া জাল॥
ছুটসি নাহীঁ উভ পয়াল।
অচর করতুতি সগলি যম ডানৈ।
গোবিংদ ভজন বিনু তিল নহীঁ মানৈ॥
হরিকা নাম জপত দুখ যাই।
নানক বোলৈ সহজি সুভাই ॥৪

অনেক সেয়াস্থমী নবেও যমভয় যায় না, অনেক যত্নেও তৃষ্ণা দূর হয় না। নানা প্রকার ভেখ ধারণ করিলেও মনের অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না।
কোটী উপর করিলেও ভগবানের দ্বারে যাইবার অধিকারী হয় না।
জন্ম ও মরণ হইতে তাহার মুক্তি হয় না।
মোহ এবং মায়া জাল ব্যাপ্ত করে।
আর সকল কার্য্যেই যমের দণ্ড পতিত হয়।
গোবিন্দ ভজন ব্যতীত কোথাও তিল মাত্র সম্মান নাই।
হরি নাম জপ করিলে দুঃখ দূর হয়।
নানক বলিতেছেন, ইহাতে সহজেই সুখ হয় ॥৪

চার পদারথ যে কো মাগৈ।
সাধ জন কী সেবা লাগৈ।
যে কো অপনা দুখ মিটাবৈ।
হরি হরি নাম রিদৈ সদ গাবৈ।
যে কী অপনী সোভা লোরৈ।
সাধ সঙ্গ ইহ হউ মৈ ছোরৈ ধ।
কো জনম মরণ তে ডরৈ।

সাধ জনা কী সরণী পরৈ।
জিস কন কউ প্রভ দরশ পিয়াসা।
নানক তাকৈ বলি বলি যাসা ॥৫

যে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারি পদার্থ লাভ করিতে চায়,
তাহার উচিত সাধু জনের সেবা করা।
যে নিজের দুঃখ নিবারণে অভিলাষী হয়,
সে হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা হরি নাম গান করুক।
যে নীজের শোভা দর্শন করিতে চায়,
সাধু সঙ্গ করিয়া সে নিজের অহঙ্কর ত্যাগ করুক।
যাহার জন্ম মরণের ভয় আছে,
সে সাধুজনের স্মরণ লউক।
যে ব্যক্তির অন্তঃকরণে প্রভুকে দর্শন করিবার পিপাসা আছে।
নানক বলিতেছে, সেই ব্যক্তিকে বলিহারি যাই ॥৫

সকল পুরুষ মহি পুরুখ প্রধান।
সাধ সংগ যাকা মিটৈ অভিমান।
আপন কউ যো জনৈ নীচা।
সউ গনীয়ৈ সভতে উচা।
যাকা মন হোয় সগল কী রীনা।
হরি হরি নাম তিন ঘটি ঘটি চীনা।
মন অপনেতে বুরা মিটানা।
পেখৈ সগল সৃষ্টি সাজ না।
সুখ দুঃখ জন সম দৃষ্টেতা।
নানক পাপ পুংন নহী লেপা।৬

সকল পুরুষের মধ্যে তিনিই পুরুষ শ্রেষ্ঠ
যাহার অভিমান সাধু সঙ্গে দূর হইয়াছে।
যিনি আপনাকে নীচ বলিয়া জানেন,
তাঁহাকেই সকলের উচ্চ বলিয়া গণনা করা হয়।
যাঁহার মন সকলের পদরেণু হইয়া থাকে
তিনি ঘটে ঘটে হরিনাম দর্শন করেন।
যিনি নিজের মনেতেই মনবিকারকে নষ্ট করিয়াছেন,
তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে বন্ধুকে দর্শন করেন।
যাঁহার সুখ ও দুঃখে সম দৃষ্টি
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে পাপ পুণ্যে লিপ্ত করিতে পারে না ॥৬

নিরধন কউ ধন তেরী নাউ।
নিথাবে কউ নাউ তেরী থাউ।
সগল ঘটা কউ দেবহু দান।
করন করাবন হার স্বামী।
সগল ঘটাকে অংতর জামী।
অপনী গতি মিতি জানহু আপে।
আপন সংগি আপি প্রভ রাতে।
তুমরী উসততী তুমতে হোয়।
নানক অবর ন জানসি কোয় ॥৭

হে প্রভু! তোমার নাম নির্ধনের ধন।
যাহার গৃহ নাই তাহার তুমি গৃহ।
যাহার মান নাই, তাহার তুমি সম্মান।
সকল জীবকে তুমি দান করিতেছ।
হে স্বামী! তুমি সকল সৃষ্টির কারণ।
সকল জীবের তুমি অন্তর যামী।
তোমার গতি এবং কার্য্য তুমি আপনিই জান।
হে প্রভু! তুমি নিজের আনন্দে নিজেই মগ্ন।
তোমার স্তুতি তুমিই করিতে পার।

নানক বলিতেছে, অপর কেহ তোমার মহিমা জানে না॥৭

সরব ধর্ম্ম মহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
হরি কো নাম জপি নির্ম্মল কর্ম্ম॥
সগল ক্রিয়া মহি উত্তম কিরিয়া।
সাধ সংগ দুর্ম্মতি মল হিরিয়া॥
সগল উদম মহি উদম ভলা।
হরি কা নাম জপহু জীয় সদা॥
সগল বাণী মহি অমৃত বাণী।
হরি কো যশ শুনি রসন বখানী॥
সগল থান তে ওহ উত্তম থান।
নানক জিহ ঘট বসৈ হরি নাম॥৮

সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম
নির্ম্মল কর্ম্ম হরিনাম জপ করা।
সকল ক্রিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া
সাধু সঙ্গে মনের মলা দূর হয়।
সকল উত্তমের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ উত্তম
যদি জীব সর্ব্বদা হরিনাম জপ করে।
সকল বাণীর মধ্যে সেই অমৃত বাণী,
যদি হরির যশ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা হয়।
সকল স্থান হইতে সেই উত্তম স্থান,
নানক বলিতেছেন, হৃদয়ে হরিনাম বর্ত্তমান।

ন শ্লোক।

নিরগুনিয়ার ইয়ানিয়া সো প্রভু সদা সমালি।
জিন কীয়া তিস চীতি রখ নানক নিবহী নালি।

হে গুনহীন, হে মূর্খ সেই প্রভুকে সর্ব্বদা মনে রাখ।
নানক বলিতেছেন, যিনি তোমাকে স্মৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে চিত্তে রাখ। তিনি সঙ্গে যাইবেন।

অষ্টপদী।

রমইয়া কে গুণ চেত পরাণী।
কবন মূল তে কবন দৃষ্টানী॥
জিন তুঁ সাজি সবার সীগারিয়া।
গরভ অগন মহি জিনহি উবারিয়া॥
বার বিবস্থা তুঝহি পিয়ারৈ দুধ।
ভরি জীবন ভোজন সুখ সুধ॥
বিরধ ভয়া উপর সাক সৈন।
মুখ অপিয়া উ বৈঠ কউ দৈন॥
ইহ নির গুণ গুণ কছু ন বুঝৈ।
বখস লেহু ত উ নানক সীঝৈ॥১

হে প্রাণী, যিনি সকলের মধ্যে রমণ করিতেছেন তাঁর গুণ মনে রাখ।
যিনি সকলের মূল তাঁহার দৃষ্টান্ত কি আছে?
যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও শোভান্বিত করিয়াছেন,
যিনি তোমাকে গর্ভ অগ্নি হইতে রক্ষা করিয়াছেন।
শৈশব কালে যিনি দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।
যৌবন কালে ভোজন, সুখ ও আনন্দ দিয়াছেন।
বৃদ্ধকালে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে রাখিয়া দেন।
তোমার মুখে আহার দিতেছেন, যাহাতে তুমি বসিয়া থাকিতে পার।
হে প্রভু! গুণহীন ব্যক্তি তোমার গুণ কিছুই বুঝেন না।

নানক বলিতেছেন, ক্ষমা কর তাহা হইলেই আমি সিদ্ধ হইব ॥১

জিহ প্রসাদি ধর উপর সুখ বসাই।
সুত ভ্রাত মীত বনিতা সংগি হসাই।
জিহ প্রসাদি পীবহি শীতল জলা।
সুখদাই পবন পাবক অমুলা।
জিহ প্রসাদি ভোগহি সভ রসা।
সগল সমগ্রী সংগী সাথ বসা।
দীনে হসত পাব করন নেত্র রসনা।
তিসহি তিয়াগ আবর সংগি রচনা।
ঐসে দোষ মূঢ় অন্ধ বিয়াপে।
নানক কাঢ় লেহু প্রভ আপে ॥২

যাঁর প্রসাদে ধরার উপর সুখে বাস করিতেছ,
এবং সুত ভ্রাতা বন্ধু ও স্ত্রীর সঙ্গে হাসিতেছ,
যাঁর প্রসাদে শীতল জল পান করিতেছ,
সুখদায়ক পবন সেবন করিতেছ এবং অমূল্য অগ্নি পাইয়াছ,
যাঁহার প্রসাদে সকল প্রকার রস ভোগ করিতেছ,
এবং সকল সামগ্রী সহ সুখে বসিয়া আছ।
যিনি হস্ত, পদ, কর্ণ, নেত্র ও রসনা দিয়াছেন।
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তুমি অন্য কর্ম্মে রত,
এই দোষ মূঢ় অন্ধকে ব্যাপিয়া আছে।
নানক বলিতেছেন, হে প্রভু তুমি নিজে আমাকে টানিয়া লও ॥২

আদি অন্ত যো রাখন হার।
তিস সিউ প্রীতি ন করৈ গবার।
যাকী সেবা নবনিধি পাবৈ।
তাসিউ মূঢ়া মন নহী লাবৈ।
যো ঠাকুর সদ সদা হজুরে।
তাকউ অন্ধা জানত দুরে।
যাকী পাবৈ দরগহ মান।
তিসহি বিসারৈ মুগধ অজান।
সদা সদা ইহু ভুলন হার।
নানক রাখন হার অপার ॥৩

যিনি আদিতে এবং অন্তে রক্ষা করেন
মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই প্রীতি করে না।
যাঁর সেবাতে নবনিধি পাওয়া যায়
মূর্খ ব্যক্তিগণ তাঁহার দিকে মন দেয় না।
যে ঠাকুর সর্ব্বদা সম্মুখে আছেন
অন্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দূরে মনে করে।
যাঁহাকে পাইলে ভগবানের দ্বারে সম্মান হয়।
মুগ্ধ অজ্ঞ তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে।
সদা সর্ব্বদা এইরূপ ভুল হইতেছে।
নানক বলিতেছেন, তাঁহার রক্ষা করাও অপার ॥৩

রতন তিয়াগী কৌড়ী সংগি রচৈ।
সাচ ছোড় ঝুট সংগি মচৈ ॥
যো ছড়না সু অসথির কর মানৈ।
যো হোবন সো দূর পরানৈ ॥
ছোড় যায় তিসকা শ্রম করৈ।
সংগি সহাই তিস পর হরৈ ॥
চংদন লেপ উতারৈ ধোয়।
গরধব প্রীতি ভসম সংগ হোয় ॥
অন্ধ কূপ মহি পতিত বিকরাল।
নানক কাঢ় লেহু প্রভ দয়াল ॥৪

রত্ন ত্যাগ করিয়া কড়ি লইয়া খেলিতেছ,

সত্য ছাড়িয়া মিথ্যাতে মজিলে,
যাহা অনিত্য তাহাকে নিত্য বলিয়া বুঝিলে,
যাহা সত্য তাহাকে দূরে ফেলিলে,
যাহা থাকিবে না তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছ,
যাহা সঙ্গে যাইবে তাহাকে পরিত্যাগ করিলে।

চন্দনের লেপ তুমি ধুইয়া ফেলিলে
কারণ গর্দ্দভের প্রীতি ভস্মের সঙ্গেই হইয়া থাকে।

যে মহা অন্ধ কূপে পতিত
হে দয়াল প্রভু! সেই নানককে উদ্ধার কর॥৪

করতুতি পশুকী মানস জাতি।
লোক পচারা করৈ দিন রাতি।
বাহর ভেষ অন্তর মল মায়া।
ছপসি নাহি কুছ করৈ ছপায়া।
বাহর জ্ঞান ধ্যান ইস্‌নান।
অন্তর বিয়াপৈ লোভ সুআনি।
অন্তর অগনি বাহরি তন সুয়াহ।
গল পাথর কৈসে তরে অথাহ।
জাকৈ অন্তর বসৈ প্রভু আপি।
নানক ভেজন সহজি সমাতি॥৫

কার্য্যে পশুর ন্যায় জাতিতে মানুষ,
এই প্রকারে পৃথিবীতে দিন রাত্রি ঘুরিতেছে।

বাহিরে ভেখ, অন্তরে মায়ার মলা,
তাহারা চেষ্টা করিয়াও ঢাকা দিয়া রাখিতে পারে না।

বাহিরে জ্ঞান ধ্যান এবং স্নান,
কিন্তু অন্তরে কুকুরের ন্যায় লোভ,
অন্তরে অগ্নি বাহিরে ভস্ম দিয়া ঢাকা।
গলায় পাথর বাঁধা কিরূপে অগাধ সমুদ্রে তরিবে?

যাহাদের অন্তরে প্রভু আপনি আসেন,
নানক বলিতেছেন, তাহারা সহজেই তাঁহাতে মগ্ন হয়॥৫

শুণ অন্ধা কৈসে মারগ পাবৈ।
কর গহি লেহু ওড় নিবহাবৈ।
কহা বুঝারত বুঝৈ ভোরা।
নিসি কহীয়ে তউ সমঝৈ ভোরা।
কহা বিষম পদ গাবৈ গুংগ।
যতন করৈ তউভী সুর ভংগ।
কহ পিংগল পরবত পর ভবন।
নহী হোত উহা উস গবন।
করতার করুণা মৈ দীন বেনতী করৈ।
নানক তুমারী কিরপা তরৈ॥৬

শুধু কর্ণে শুনিয়া অন্ধ কিরূপে পথ পাইবে!
তাহার হস্ত ধরিয়া পথে লইয়া যাইতে হইবে।

বধির ব্যক্তি কূট বাক্য কিরূপে বুঝিবে?
যদি তাহাকে বল রাত্রি সে বুঝিবে ভোর।
গুঙ্গা কি কখন বিষ্ণুর গান গাহিতে পারে
যত্ন করিলেও সুর ভঙ্গ হইয়া যায়।
খঞ্জ ব্যক্তি কি কখনও পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে?
সে কখনই পর পারে যাইতে পারে না।
হে সৃষ্টি কর্ত্তা, করুণাময়! দীন তোমাকে মিনতি করিতেছে,
নানক তোমার কৃপাতেই তরিতে পারে॥৬

সংগি সহাই সুথাবৈ ন চীতি।

যো বৈরাই তাসি উ প্রীতি।
বসুয়া কে গৃহ ভীতর বসৈ।
অনদ কেলি মায়া রংগি রসৈ।
দৃঢ় করি মানৈ মনহি প্রতীত।
কাল ন আবৈ মূঢ়ে চীতি।
বৈর বিরোধ কাম ক্রোধ মোহ।
ঝুট বিকার মহা লোভ ধ্রোহ।
ইয়াহ জুগতি বিহনে কই জনম।
নানক রাখ লেহু আপন কর করম ॥৭
যিনি সঙ্গী ও সহায় তাঁহাকে মনে পড়ে না।
যাহার সঙ্গে বৈরতা, তাহারই প্রতি প্রীতি করে।
বালির গৃহেতে বাস করে,
এবং সেখানে মায়ার রঙ্গরসে সে মাতে।
মায়ার কার্য্যকেই মনে দৃঢ় করিয়া মানে।
কালের ভাবনা সেই মূঢ়ের মন মধ্যে আসে না।
বৈরতা, বিরোধ, কাম, ক্রোধ এবং মোহ,
মিথ্যা এবং মনবিকার, মহালোভ ও খলতা।
এই সকল লইয়া কত জন্মই যাওয়া আসা করে।
নানক বলিতেছেন, প্রভু আপনার দয়া বিস্তার করিয়া রক্ষা কর ॥৭
তুঁ ঠাকুর তুম পহি অরদাস।
জীউ পিংড সভ তেরী রাস॥
তুম মাত পিতা হম বারিক তেরে।
তুমরী কৃপা মহি সুখ ঘনেরে॥
কোই ন জানৈ তুমরা অন্ত।
উচে তে উচ্চ ভগবন্ত॥
সগল সামগ্রী তুমরে সুত্রধারী।
তুমতে হোয় সু আজ্ঞাকারী॥
তুমরী গতি মিতি তুমহী জানী।
নানক দাস সদা কুরবানী॥৮
তুমিই ঠাকুর, তোমার নিকট নিবেদন,
আত্মা এবং শরীর সকলই তোমার বস্তু।
তুমিই মাতা পিতা, আমরা তোমার সন্তান,
তোমার কৃপার মধ্যেই সুখ।
তোমার অন্ত কেহ জানে না।
তুমি ভগবান উচ্চ হইতেও উচ্চ।
তোমার সূত্রে সকল সামগ্রী গাঁথা।
তোমারই সৃষ্ট সকল তোমারই আজ্ঞাকারী
তোমার গতি মতি প্রভু তুমিই জান।
নানক দাস সর্ব্বদা তোমাকেই আত্মবলি দিতেছে।৮

৫ শ্লোক।

দেনহার প্রভু ছাড়িকৈ লাগহি আন সুয়ায়।
নানক কহু ন সীঝই বিন নাবৈ পতি যায়॥১
দয়ার আধার প্রভুকে ছাড়িয়া যে অন্যতে আকৃষ্ট হয়,
নানক বলিতেছেন, সে কখনও সিদ্ধি লাভ করে না,
নাম না পাইয়া সে পতিত হয়॥১

অষ্টপদী।

দশ বস্তুলে প ছৈ পাবৈ।
এক বস্তু কারণ বিথোটি গবাবৈ॥
এক ভী ন দেয় দশ ভী হির লেয়।
তউ মূঢ়া কহু কহা করেয়॥
জিস ঠাকুর সিউ নাহী চারা।
তাকউ কীজৈ সদ নমস্কারা॥

জৈকৈ মন লাগা প্রভু মীঠা।
সরব সুখ তাহু মন বুটা॥
জিন জন আপনা হুকুম মনায়া।
সব থোক নানক তিন পায়া॥১

ভগবানের দত্ত দশ বস্তু লইয়া তুমি নিকটে রাখিলে,
কিন্তু আবার এক বস্তু লাভের চেষ্টায় বিশ্বাসকে হারাইলে।
তোমার বিশ্বাস চলিয়া যাওয়ায় তুমি সে বস্তু পাইলে না এবং দশ বস্তু যাহা ছিল তাহাও হারাইলে।
হে মূঢ়, বল তখন তুমি কি করিবে?
যে ঠাকুর ব্যতিত আর কোন উপায় নাই,
হে মানব, তাঁহাকেই সর্ব্বদা নমস্কার কর।
যে মানুষের মনে প্রভুকে মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়,
তাহার মধ্যে সর্ব্বদা সুখ ও শান্তি বিরাজ করে।
যে ব্যক্তি তাঁহার আদেশ মানিয়া চলে,
নানক বলিতেছেন, সকল বস্তুই সে প্রাপ্ত হয়॥১

অগনত সাহু অপনী দে রাস।
খাত পীত বরতৈ অনদ উলাস॥
অপনী অমান কুছ বহুর সাহু লেয়।
অজ্ঞানী মন রোস করেয়॥
অপনী প্রতীতি আপহী খোবৈ।
বহুর উসকা বিশ্বাস ন হোবৈ॥
জিনকী বস্তু তিস আগৈ রাখৈ॥
প্রভুকী আজ্ঞা মানৈ মাথৈ।
উস্‌তে চৌগুন করৈ নিহাল।
নানক সাহিব সদা দয়াল॥২

অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ভগবান কত বস্তু দিতেছেন।
মানুষ তাহা আহার ও পান ও আনন্দে ভোগ করিতেছে।
ভগবান নিজে নির্লিপ্ত, কিন্তু কিছু যদি আবার মানুষের নিকট হইতে ফিরাইয়া লন,
অজ্ঞান মানুষ তাহাতে রাগ করে।
তখন তাহার মনের বিশ্বাস চলিয়া যায়।
পুনরায় তাহার বিশ্বাস মনে আসে না।
হে মানব, যাঁর বস্তু তাঁর সম্মুখে রাখ,
এবং তাঁর আজ্ঞা মস্তকে রাখিয়া পালন কর।
তাহা হইলে ভগবান তোমাকে চার গুণ কৃতার্থ করিবেন।
নানক বলিতেছেন, সেই প্রভু সদা দয়াল॥২

অনিক ভাতি মায়া কে হেতু।
সরপর হোবত জান অনেত॥
বিরথকী ছায়া সিউরংগ লাবৈ।
ওহ বিনসৈ ওহ মন পছতাবৈ॥
যো দীসৈ সো চালন হার।
লপট রহিও তহ অন্ধ অন্ধার॥
বটাঊ সিউ যো লাবৈ নেহ।
তাবউ হাথি ন আবৈ নেহ।
মন হরিকে নামকী প্রীত সুখদাই।
কর কিরপা নানক আপ লত লাউ॥৩

মায়ার বস্তুতে অনেক যত্ন করিতেছ,
কিন্তু তাহা অনিত্য, চলিয়া যাইবে।
যদি কেহ বৃক্ষের ছায়ায় আনন্দ করিতে থাকে,

ছায়া চলিয়া গেলে, মনে অনুতাপ করে।
যাহা দেখিতেছ তাহা অস্থায়ী।
যে ইহাতে মাতিয়া থাকে সে একেবারে অন্ধ।

যে পথিকের প্রতি প্রেম করে,
তাহার কিছুই প্রাপ্তি হয় না।
হে মন, হরি নামে প্রীতিই শান্তিকর
নানক বলিতেছেন তিনি কৃপা করিয়া এই প্রেম দান করেন ॥৩

মিথিয়া তন ধন কুটংব সবায়া।
মিথিয়া হউমৈ মমতা মায়া ॥
মিথিয়া রাজ জোবন ধন মাল।
মিথিয়া কাম ক্রোধ বিকরাল ॥
মিথিয়া রথ হস্তী অশ্ব বস্ত্রা।
মিথিয়া রংগ সংগ মায়া পেন হস্তা ॥
মিথিয়া ক্রোধ মোহ অভিমান।
মিথিয়া আপস উপর করত গুমান ॥
অস্থির ভগত সাধকী সরন।
নানক জপ জপ জীবৈ হরিকে চরণ ॥৪

বৃথা তনু, ধন এবং কুটুম্ববর্গ
বৃথা অহঙ্কার এবং মায়া মমতা।
বৃথা রাজ্য, যৌবন, ধন এবং বিষয়।
বৃথা কাম এবং বৃথা বিকট ক্রোধ।
বৃথা রথ, হস্তী, অশ্ব এবং বস্ত্র।
বৃথা মায়ার রঙ্গ সঙ্গ, বৃথা দৃশ্য এবং হাস্য।
বৃথা ক্রোধ মোহ এবং অভিমান।
আপনাকে বড় মনে কর, তাহাও বৃথা।
সাধু ভক্তের শরণ লইয়া সাধন করাই স্থায়ী কার্য্য।
নানক বলিতেছেন, হে জীব অহরহ হরি চরণ জপ কর ॥৪

মিথিয়া শ্রবণ পর নিংদা শুনহি।
মিথিয়া হস্ত পর দরব কউ হিরহি।
মিথিয়া নেত্র পেখত পর ত্রিয় রূপাদ।
মিথিয়া রসনা ভোজন অনস্বাদ।
মিথিয়া চরণ পর বিকার কউ ধাবহি।
মিথিয়া মন পর লোভ লুভাবহি।
মিথিয়া তন নহী পর উপকারা।
মিথিয়া বাস লেড বিকারা।
বিন বুঝে মিথিয়া সভ ভও।
সফল দেহ নানক হরি হরি নাম লও ॥ ৫

কর্ণ বৃথা যদি তাহা পরনিন্দা শ্রবণ করে।
হস্ত বৃথা যদি তাহা পরদ্রব্য হরণ করে।
নেত্র বৃথা যদি তাহা পর স্ত্রীর রূপ দর্শন করে।
রসনা বৃথা যদি তাহা অভোজ্য ভোজন করে।
চরণ বৃথা যদি তাহা পরকে কষ্ট দিবার জন্য ধাবমান হয়।
মন বৃথা যদি তাহা পরবস্তু লোভে মুগ্ধ হয়।
শরীর ধারণ বৃথা, যদি তাহা পর উপকার না করে।
বাস গৃহ বৃথা যদি তাহাতে এইরূপ বিকার হয়।
ভগবানকে না বুঝিলে সকলই বৃথা হয়।
নানক বলিতেছেন, হরি নাম লইলেই সফল দেহ হয়।৫

(ক্রমশঃ)

অজিতের সন্ন্যাস।

১

বেলা অবসান প্রায় দুইটী যুবক আগ্রার তাজ মহলের ভিতর, একটা প্রবেশ দ্বারের উপর বসিয়া ছিলেন। অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণবর্ণ কিরণছটা, উদ্যানের বৃক্ষের মাথায় ও তাজের চূড়ার উপর খেলা করিতেছিল। স্থানটি শান্ত এবং নিস্তব্ধ। যুবকদ্বয়ের এক জন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অজিত! এখানে বস্‌লে কি আর বাড়ী যেতে ইচ্ছা হয়?" অজিত বলিলেন, "সত্য বল্‌ছি উপেন, আমার এখানে বস্‌লে বাড়ীর কথা একটুও মনে হয় না, মনে যেন কি একটা ভাব আসে। আজ কি ঐশ্বর্য্য, কি বিলাস, কি উদ্ভাবনী শক্তি, কি শিল্পের পরিচয় দিতেছে! কিন্তু দেখ জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে, এই শিল্পী, এই ধনবান, ইহাদেরও ত বিনাশ আছে।"

উপেন। তা' আছে বৈকি! আরও দেখ কাল পরিবর্ত্তনশীল, যেস্থান এক দিন প্রহরী বেষ্টিত থাকিয়া লোকলোচনের অগোচর ছিল, আজ তাহা আমাদের মত নগণ্য লোকদেরও দেখা দিয়া তৃপ্ত করিতেছে। আজ যে দুঃখী কাল সে সুখী, আজ যে ধনবান কাল সে নির্ধন, আজ আমরা গরিব কাল হয়ত বড়লোক হ'তে পারি।

অজিত। আমার পক্ষে আর তা'হা হ'বে না।

উপেন। তা' বলা যায় না। বিশেষ তুমি এম্. এ, পাশ করা ছেলে, তোমার উন্নতি,ত হয়েই আছে।

অজিত। সে কাল আর নাই, এখন এম, এ, পাশের ভাগ্যে ৫০৲ টাকা মাহিনার চাকরী। তবে যদি আলফলায়লার আবুহোসেনের মত কোন দিন ঘুম ভেঙ্গে উঠে দেখি যে সম্রাট হয়েছি, সে কথা স্বতন্ত্র।

উপেন। দেখ অজিত, একটা কথা মনে হ'ল, তুমি বিয়ে করবে? আমার একটা সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু আমার মন নাই, তুমি করত দিয়ে দিই।

অজিত হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বলেছ, এদিকে ন পিতা ন মাতা, এদিকে আপনার বলতে একটী পয়সা নাই, মেসে থাকি, স্কুলে মাষ্টারি করে দিন চালাই, এই বিয়ের উপযুক্ত অবস্থাই বটে। তুমি বরং কর তোমার অবস্থা অনেক ভাল, ও সব সন্ন্যাস করা'সের মতলব ছেড়ে দাও, বিয়ে হ'লেই মনের বৈরাগ্য কমে যা'বে।

উপেন। না অজিত, সম্বন্ধটী খুব ভাল, বাপের একটি মেয়ে তাদের অগাধ পয়সা, তা'রা একটী ভাল ছেলে চায়, নিজের বাড়ীতেই রাখবে। আমিত করবই না, যদি তুমি কর ত এখনি দিয়ে দিই।

অজিত মন্দ নয় বটে, কিন্তু তা'রা কি আমায় পছন্দ করবে? যদি করে ত দেখ।

উপেন। আমার মনে হয় করবে, কিন্তু

তা'হ'লে তুমি কত বড়লোক হ'বে, হয়ত আমাকে চিনিতেই পারবে না।

অজিত। আমার যদি কখনও পয়সা হয়, অহঙ্কার বলে জিনিসটা শরীরে স্থানই পাবে না। এই দরিদ্রাবস্থা থেকে যদি কখনও উন্নত হ'তে পারি, দেখো জগতের কত উপকার কর্‌ব, গ্রামে গ্রামে জলাশয় খনন কর্‌ব, দরিদ্রের জন্য অতিথিশালা স্থাপন কর্‌ব, দুষ্ট ছাত্রের জন্য স্কুল খুল্‌ব, কন্যা দায়গ্রস্তকে সাহায্য কর্‌ব —

বাধা দিয়া উপেন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "থাক্ থাক্ আর না, সে আর পেরে উঠ্‌বে না, পয়সা হ'লে কি ও সব মনে থাকে? তখন "চেরিব্লসম" ভাল না "হাসনা হানা" ভাল? স্বদেশী পমেটম কিছু নয় "ভিনোলিয়া" পমেটম ভাল! ঘুড়ীচড়া সেকেলে ফ্যাসান, মটরকার চাই।

অজিত বলিলেন, "আচ্ছা যদি কখনও হয় দেখো, পরোপকারে আত্মজীবন নিয়োগ কর্‌ব। এখন এস একটু বেড়াই।"

উভয়ে উঠিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত তাজমহল, মধ্যে একটি গম্বুজ ও চারি পার্শ্বে চারিটি মিনার, ভূমি তলে স্থানে স্থানে নানাবর্ণের প্রস্তরে গালিচা অঙ্কিত, অট্টালিকার গায়ে অতি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে, সুন্দর নানাবর্ণের প্রস্তরে খচিত লতাপাতা দ্বারের পার্শ্বে ও উপরে, স্তম্ভগাত্রে শোভিত আছে, গোর স্থানে মধুর মৃগনাভির সুগন্ধ। তাজমহলের উদ্যানে হরিৎ, লোহিত নানাবর্ণের তৃণে গালিচা বিনির্ম্মিত হইয়া দর্শকের ভ্রম ও প্রীতি উৎপাদন করিতেছে, প্রবেশ দ্বার হইতে তাজের সোপানে উঠিতে পথের দুইপার্শ্বে কৃত্রিম জলাশয়, তাহাতে আবার ২।১টী পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, এবং একটীতে মধুমক্ষিকা চক্র প্রস্তুত করিয়াছে। তাজের পার্শ্ব দিয়া যমুনা প্রবাহিত, তাহার অপর পারে হরিৎবর্ণ শস্য ক্ষেত্র, তাহার পার্শ্বে গ্রাম, কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর শ্রেণী দূর হইতে যেন খেলা ঘরের মত দেখাইতেছে। অজিত ও উপেন্দ্র প্রীতি-বিকশিত নয়নে সমস্ত চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পরে উপেন্দ্রের যত্নে কলিকাতার সেই ধনী কন্যা পঙ্কজিনীর সহিত অজিতের বিবাহ হইয়াছিল। অজিতের সুগঠন ও অবয়ব, সৎ চরিত্র, বিদ্যা ও নম্রস্বভাব, ধনীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল, সে জন্য দীন হীনকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়া তিনি নিজগৃহে রাখিয়া দিলেন।

২

অজিতের বাহিরের ঘরে উজ্জ্বল দীপালোক প্রতিফলিত, সবে মাত্র সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু অজিত নয়ন মুদ্রিত করিয়া মখমল মণ্ডিত চেয়ারের উপর অর্দ্ধ শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের স্থূল গৌরবর্ণ অঙ্গুলির উপর হীরকাঙ্গুরীয় দীপালোকে ঝক্‌মক করিতেছে, মাথার উপর পাখা চলিতেছে, অজিতের সুবিন্যস্ত কেশের সুগন্ধতৈলের সৌরভ বায়ুতে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে, উপেন্দ্র আসিয়া

দ্বারের উপর দাঁড়াইলেন। সেই শীর্ণ দীন হীন যুবকের পরিবর্ত্তে, এই হৃষ্টপুষ্ট অবয়ব দেখিয়া তিনি যেমন সুখী হইলেন, তেমনই সেই নম্র, সঙ্কোচময়, সরল মুখের পরিবর্ত্তে অসদ্ভাব প্রতিফলিত দাম্ভিক মুখচ্ছবি দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক অসুখী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "অজিত"! আহ্বানে চক্ষু চাহিয়া অজিত বলিলেন, "উপেন, এসেছ? এস। তুমি যে ভারি সন্ন্যাসী হয়ে পড়লে, একেবারে পরিব্রাজক হয়ে কোথায় যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ, খুঁজেও পাই না। কবে এসেছ?"

উপেন অন্য চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, "এদেশে ছিলাম না, সম্প্রতি এসেছি।" ২।১টা কথার পর উপেন বলিলেন, আমি চার পাঁচ বৎসর আগে যখন যাই, তখন দেখিয়া গেলাম তোমার শ্বশুর যে লোহার কারবার করে দিলেন তা'তে খুব উন্নতি করেছিলে, আর নিজের পয়সায় নানা সৎকার্য্য করতে ও সৎচরিত্র ছিলে। কিন্তু এই কয় বৎসর পরে এসে দেখি যে, সে স্বভাব একেবারে হারিয়েছ, লোকের সঙ্গে অসৎ ব্যবহার কর, লোককে ফাঁকি দাও, কোন রকম সৎকার্য্য আর কর না, নিজে অসৎ চরিত্র হয়েছ। অজিত! তোমার মত শিক্ষিত যুবার কি এই পরিণাম?

অজিত। নিজের চরিত্র কৈ নষ্ট করেছি, আর কারেই বা ফাঁকি দিয়েছি? বাঙ্গালীর স্বভাব, লোকের ভাল হলেই তার সঙ্গে লাগে।

উপেন। তুমি কি ইংরাজ? বাঙ্গালীর নিন্দা অন্য জাতি করলে বরং সহ্য হয়, কিন্তু বাঙ্গালী করলে বড় প্রাণে লাগে। বাঙ্গালীর সহস্র দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তার নিন্দা না করে সংশোধনের চেষ্টা করাই ত উচিত। একটা বিশাল জাতি যত পুরাতন হইয়া আসে, তাহাতে নানা প্রকারের লোক উৎপন্ন হইয়া তাহাকে কতকটা নিন্দনীয় করে কিন্তু আবার তেমনই মনস্বী ব্যক্তি উৎপাদিত হইয়া তাহার দোষ সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। তোমার চরিত্রের কথা জিজ্ঞ সা করিব, তোমার মুখে এখনও কিসের গন্ধ বল দেখি?

অজিত উগ্রভাবে বলিলেন, "ও সব লেকচার দিবার জন্য তুমি এসোনা, ওসব কথা বলত আসবার দরকার নাই, আমার ঢের বন্ধু আছে।"

উপেন। তা'রা তোমার বন্ধু না শত্রু যাহারা তোমার পয়সায় তোমায় নষ্ট করে? সেই পশুগুলা কি তোমার মত সুশিক্ষিত যুবার উপযুক্ত?

অজিত সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "রাত্রি ৮টা বাজে, আমার বিশ্রামের সময় হয়েছে, এ সময় আমি কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে পারি না, তুমি বিদায় হও।" অজিত অন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন।

৩

অজিতের চরিত্র দোষ দেখিয়া তাঁহার শ্বশুর বড় বিরক্ত হইতেন, এবং অজিতও তাহা বুঝিয়া বিরক্ত হইতেন, এইরূপে

দিন দিন উভয়ের মনোমালিন্য জন্মিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর অজিত আসিয়া আপন শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন, তাঁহার চরণ যুগল টলিতেছিল। গৃহমধ্যে পঙ্কজিনী পালঙ্কের কাষ্ঠদণ্ডে মস্তক রক্ষা করিয়া ভূতলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। পঙ্কজিনীর কিসের চিন্তা? অথবা অসৎ স্বামীর পত্নীর আবার চিন্তার অভাব কি? চিন্তা এবং অশ্রুজল তাঁহার অঙ্গের আভরণ, মুখের মলিন ও স্ফুর্তি-শূন্য ভাব, নয়নের বিষাদময়ী দৃষ্টি, তাঁহাদের মনোবেদনার সাক্ষ্য প্রদান করে। তিনি হৃদয়ে সতত যে একটা গভীর বেদনা অনুভব করেন, অন্য শত আনন্দে তাহা অপসারিত হয় না। সে বেদনা হীরার নেক্‌লেস, মুক্তার মালা, সিল্কের জ্যাকেটের অন্তরালে থাকিয়াও অভাগিনীর জীবন তিল তিল করিয়া ক্ষয় করে।

পঙ্কজিনীর ছোট ছেলেটী ও মেয়েটী নিকটে বসিয়া খেলা করিতেছিল। মেয়েটি মাতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া খেলা পরিত্যাগ করিয়া নিকটে আসিল, এবং মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "মা! তুমি রাত দিন কাঁদ কেন?" অজিত দ্বারের উপর হইতে বলিলেন, "ঠিক কথা রাত দিন কান্না ভাল লাগে না।" পঙ্কজিনী স্বামীকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া শয্যার উপর বসাইলেন, অজিত শয্যায় বসিয়া বলিলেন, "এ কান্নার একটা নিষ্পত্তি কর, রাত দিন এ যে ভাল লাগে না।" পঙ্কজিনী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তুমি কাঁদাও তাই কাঁদি।"

অজিত। কিন্তু আমিত তা' ভাল বাসি না, তাহ'লে তোমায় অন্য জায়গায় গিয়া থাকতে হ'বে। পঙ্কজিনীর পিতা গৃহের বাহির দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া বলিলেন, "ওর অন্য জায়গায় গিয়ে থাক্‌বার কথা নয়, তুমি এখনি অন্য জায়গায় গিয়ে থাক"।

অজিত আরক্ত মুখে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "এই চল্লেম, তোমার মতন দশটা শ্বশুরকে আমার চাকর রাখ্‌বার ক্ষমতা আছে। তোমাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত, আমি কালই আবার বিয়ে করবো।"

অজিত সক্রোধে টলিতে টলিতে চলিলেন, শ্বশুর একটু জোরের সহিত বলিলেন, "আর খবরদার এ মুখো হয়োনা। পঙ্কজিনী! তুই মনে করিস্ তুই বিধবা। রামদয়াল! পাঁড়েকে বলে দে, এই লক্ষ্মীছাড়াকে আর যেন ফটকের এদিকে আসতে না দেয়।"

অজিত চলিয়া গেলেন, পঙ্কজিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে অজিত একটী সামান্য ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, "কালের কি বিচিত্র লীলা, এক মুহূর্ত্তে ভিখারীকে রাজা ও রাজাকে ভিখারী করে। গরিবের ছেলে, কত কষ্টে লেখা পড়া শিখলেম, আমার অদৃষ্টে

কত উন্নতি হ'ল, আবার শশুরের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এলাম, দুই বৎসরের মধ্যে কারবারে লোকসান হয়ে আজ পথের ভিখারী হলেম। যখন চলে আসি শশুর কারবার কেড়ে নিতে পারতেন, শুধু পঙ্কজিনীর জন্য নেন নাই, পাছে খেতে না পাই। আহা! আমার অসৎ প্রবৃত্তিতে সতী কত কেঁদেছে, যখন চলে আসি, কত চিঠি দিয়েছে, লোক পাঠায়েছে, আমি যাই নাই, চিঠির উত্তর দিই নাই। আমার প্রাণের তপেন্দ্র ও চারুহাসিনী এখন কত বড় হয়েছে, আমি পামর পিতা তাঁদের ভুলে আছি। এখন এই সব উৎকৃষ্ট গ্রন্থই আমার সান্ত্বনা! ভগবানের চরণছায়ায় আমার চিত্তের সন্তাপ দূরে যাবে।”

উপেন্দ্র আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, “অজিত! ঘরে আছ?” “এসেছ? উপেন এসেছ? আমি যে এখন রোজ তোমায় মনে করি।” বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া অজিত বালকের ন্যায় উপেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। উপেন বলিলেন “অজিত! অজিত! আজ যেন আমাদের শৈশব কাল আবার ফিরে এল, তখন স্কুলে পড়িতাম।” উপেনের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। অজিতের শীর্ণ দেহ, মলিনবর্ণ, ম্লান মুখ, দেখিয়া উপেন অশ্রুমোচন করিলেন।

আহারের পর রাত্রিতে যখন অজিত একটী ক্ষুদ্র ট্রঙ্কে আপন পুস্তকগুলি গুছাইতেছিলেন, দ্বারের উপর যেন একটি স্ত্রীলোকের ছায়া পড়িল। অজিত মুখ তুলিয়া দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে গেলেন, এবং সাদরে আগন্তুকার হাত ধরিয়া বলিলেন, পঙ্কজিনী! আজ আমি মনে করছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করে আসি, কিন্তু তুমি যে কত যেতে বলেছ, আমি যে যাই নাই পঙ্কজিনী, তাই আজ যেতে লজ্জা হচ্ছিল।

স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া পঙ্কজিনী বলিলেন, “অন্য লোকের কাছে লজ্জা হবে বলে কি আমার কাছেও লজ্জা করবে?” স্বামীর শীর্ণদেহ, সামান্য গৃহসজ্জা, অন্ধকার অপ্রশস্ত গৃহ, দেখিয়া সতী অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। কয়েকটি কথার পর পঙ্কজিনী বলিলেন, “বাবা মারা গিয়াছেন আমি তোমায় ডাকিতে আসিয়াছি ঘরে এস। শশুরের কথা শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া অজিত বলিলেন, “আমি একবার গিয়ে মাপ চাইবার সময় পেলাম না।” উভয়ে অনেক কথা হইল, অজিতের বিপদের কথা, কারবারের কথা, অন্নকষ্টের কথা শুনিয়া কতবার পঙ্কজিনীর ক্ষুদ্র হৃদয় দুর দুর্ করিতে লাগিল, কতবার তাহার ইন্দীবর নেত্রে শিশির বিন্দুর মত অশ্রু প্রকাশ পাইল। তাহার মনোকষ্টের কথা, কিরূপে সে চিন্তায় দিবা যামিনী কাটাইয়াছে, বিনিদ্র নয়নে নিশা যাপন করিয়াছে, পিতার নিকট যাইতে চাহায় রোরুদ্যমান শিশু পুত্রকে সে কিরূপে সান্ত্বনা দিয়াছেন, সমস্ত শুনিয়া অভাগা অজিতের বক্ষ ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

কয়েকটী কথার পর অজিত বলিলেন, “পঙ্কজিনী আমি আর ঘরে ফিরে যাব না,

কয়েক মাস ধরে আমার ভগবানে মন হয়েছে, অমি আজ উপেনের সঙ্গে ঠিক করেছি কাল তার সঙ্গে নেপালে যা'ব, তা'র সঙ্গে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বাগানে বাগানে বেড়িয়ে বেড়া'ব, ভগবানের লীলা দেখে দেখে তাঁকে আরাধনা কর্‌বো।" অনেক বাদানুবাদের পর পঙ্কজিনী বলিলেন, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যা'ব, তপেন্দ্র ও চারুহাসিনী মার কাছে থাক্‌বে, তোমার যে গতি আমারও সেই গতি।" অনেক কথার পর তাহাই ঠিক হইল।

পরদিন অঙ্গের অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ও সূক্ষ্ম বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পঙ্কজিনী গেরুয়া বসন পরিধান করিলেন ও অজিত সার্ট কোট খুলিয়া গেরুয়া বস্ত্র ও চাদর পরিলেন। অজিত হাসিয়া বলিলেন, "পঙ্কজিনী! বিবাহের রাত্রিতে যে দুজনে সেজে ছিলাম, সিল্ক ভেলভেট, হীরা, মুক্তা, পুষ্প চন্দন প্রভৃতিতে, আর আজ এই সাজ, কোনটায় আমাদের ভাল মানাইয়াছে বল দেখি?"

পঙ্কজিনী হাসিয়া বলিলেন, "এইতেই মানাইয়াছে, কিন্তু কেবল গেরুয়া পরিলে চলিবে না, হৃদয় যখন গেরুয়া পরিয়া বৈরাগ্যের পরিচয় দেয়, তখনই প্রকৃত গৈরিক ধারণ করা হয়, নচেৎ গৈরিক ধারণে কেবল মানুষকে প্রতারণা করা ও ভগবানের নিকট অপরাধ করা হয় মাত্র।

অজিত বলিলেন, "আমার মতে বাহিরে গৈরিক ধারণের কোন প্রয়োজন নাই, অন্তর যদি গৈরিক ধারণ করে, ভগবান তাহাতেই প্রীত হন।"

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী বসু।

বামারচনা।

সন্তোষ।

১

যাহা আছে তাই ঢের
তাহা লয়ে রব মেতে,
যাহা নাহি, নাহি থাক্‌
নাহি সাধ তাহা পেতে,

২

আমার ভাবনা তুমি
আমা হতে ভাব বেশি,
সেধে যাব আমি শুধু
নিজ কাজ দিবানিশি।

৩

তুমি ত প্রেমের খনি
চির সত্য, শুভময়,
তোমারি সন্তান আমি
আমার কিসের ভয়?

৪

পাঠায়েছ ভব গেহে

খেলিতে জীবন খেলা

স্নেহ ভরে লবে ডেকে

ভাঙ্গিলে সাধের মেলা।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত,

চট্টগ্রাম।

বউ কথা কও।

১

কে তুমি হে পিকবর গগনে উধাও

মধুর সমীর ভরে

উধাও অম্বর পরে

প্রাণ খুলে গাহ গান—"বউ কথা কও"—

২

উদাস বাতাসে সদা ঘুরিয়া বেড়াও

নিকুঞ্জ কানন তলে

মধুর সঙ্গীত বোলে

সুললিত কণ্ঠে গাহ "বউ কথা কও"—

৩

লতা পাতা বিজড়িত নিবিড় কানন

পাতা গুলি রহি রহি

বিরহ সঙ্গীত গাহি

হতাশে নিশ্বাস শ্বাসে ঝরিছে কেমন।

৪

তুমিরে বিহগ সদা গগণে উধাও—

হেথায় সে বঙ্গবালা

সহিছে অসহ্য জ্বালা

আবার আবার গাহ "বউ কথা কও—"

৫

পশ্চিম গগণে ওই তপন লুকায়

কলসী ডুবায়ে জলে

কমনীয় কক্ষে তুলে

ধীরে ধীরে কুলবধূ গৃহ পানে যায়।

৬

ঘোমটায় ঢাকি মুখ ধীরে চলে যায়

শ্বাশুড়ীর কটু ভাষে

ননদের ঈর্ষা দ্বেষে

ভেঙ্গে গেছে ভাঙ্গা প্রান বিষ বেদনায়

৭

অলস হতাশ মনে প্রাঙ্গণে দাঁড়ায়

অমনি আড়ালে রয়ে

বউ কথা কও গেয়ে

মরমে কৌতুক পাখী জাগাও তথায়

৮

কুলবধূ গণে পাখী সাধিয়া বেড়াও

তারা সব বসি ঘাটে

নীরবে বাসন মাজে

এমন সময়ে গাহ—"বউ কথা কও"

৯

নব পরিণীতা বধূ তোমারি কুজনে

কভু আনমনে থাকি

বসনে আনন ঢাকি

লজ্জায় আরক্ত মুখী পশে গৃহ কোণে—

১০

ধন্য হে সাধক তুমি তব সাধনায়

নিগূঢ় রহস্য কথা

প্রকৃতির পটে গাঁথা

পতি বুকে কুলবধূ সলাজে লুকায়।

১১

বরিষায় মেঘারম্ভে আঁধার গগন
মেঘ গুলি ছুটে এসে
চপলা বিজলী পাশে
লুব্ধ প্রেম আলিঙ্গনে বেড়ায় কেমন।

১২

নিসঙ্গ অবলা কুলে তুমি সহচর
সমাজের নিপীড়নে
রমণী সহিছে প্রাণে
"বউ কথা কও" বুঝি ভাবে নিরন্তর

১৩

কাঁদিও না অবলারে আর না কাঁদাও
প্রাণ ভরা কত আশা
অপূরণ ভাল বাসা,
আবার আবার গাহ—"বউ কথা কও"

১৪

কত সে কাঁদিবে আর কুল অভাগিনী
সদা গৃহ কোণে রয়ে
কতই যাতনা সয়ে
পুষিবে পরাণে সদা জ্বলন্ত আগুনি।

১৫

বিহগ তোমায় ভাই স্বাধীন জীবন
ঘৃনা নাই লজ্জা নাই
শক্র উপহাস নাই
তবু তুমি কর কেন এ হেন সাধন।

১৬

শীতল সমীর সনে ঘুড়িয়া বেড়াও
কুল বধু বসি যেথা
ত্বরায় যাইয়া সেথা
কৌতুলে গাহলো গান "বউ কথা কও"

১৭

জানিনারে পাখী তোর সাধনা কেমন
নিভৃতে পরাণ পুরে
কত আশা আছে ঘিরে
তুমি কি বুঝিবে ভাই প্রাণান্ত বেদন।

১৮

অনন্ত সুনিলাকাশে ঘুরিয়া বেড়াও
তোমা ছাড়া আর ভাই
এমন সুজন কই
আবার আবার গাহ "বউ কথা কও"

শ্রীমতী প্রিয় বালা রায়।

---

৩৭ নং মথুরাসেনের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৩৯ নং আন্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 616. December 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৬ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২১। ডিসেম্বর, ১৯১৪।	১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

অতীত-পূজা।*

আমি অতীত পূজার আবশ্যকতা-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন লইয়া আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। প্রবন্ধ লিখিয়া নিজ কৃতিত্ব-প্রকাশরূপ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। ভাবের অভাব, ভাষার দরিদ্রতা এবং যুক্তিহীন-কল্পনা হয়ত সমস্তই আমাতে বর্ত্তমান; তাহা জানিয়াও যে নিরস্ত হই নাই, তাহার উদ্দেশ্য, আজিকার পূত পুণ্য তিথিতে কলি-কলুষ-নাশন প্রেমময়ের প্রেমপূর্ণ নামে, তদীয় কথা প্রসঙ্গে সময়ের সদ্ব্যবহার করা। আমার সহায়—সেই সর্ব্বৈক-নন্দন অভূতপূর্ব্ব প্রাচীন কাহিনী, এবং ভরসা—চিন্তাশীল জন-সাধারণের সহানুভূতি।

প্রতিপাদ্য প্রশ্ন সম্বন্ধে কোন অনুকূল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে, আমার বোধ হয়, যেন দেশ, কাল এবং অবস্থা বিপর্য্যয়স্বরূপ কঠিন অর্গলে তাহা চির[illegible] রুদ্ধ হইয়া আছে। [illegible] ভগবানের আদেশ, শাস্ত্র, মহাজনবাক্য এবং সর্ব্বোপরি বিশ্বাস সেই রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিবার প্রধান সহায়। বিশ্বাসকে সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিবার কারণ এই যে তাহার অভাবে অর্থাৎ অবিশ্বাসী হইলে, প্রথমোক্ত উপায়সমূহের কার্য্যকারী হইবার সম্ভাবনা নাই। এজন্য বিশ্বাস সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। আমরা দেখিতে পাই, বিশ্বাস মানব-প্রকৃতির সহিত চির-বিজড়িত-ভাবে—কি কার্য্যারম্ভে, কি কার্য্যশেষে, সকল সময়েই কখন কার্য্য-পরিচালক, কখন উৎপত্তি-কারকরূপে প্রতিভাত হয়। কখন কার্য্য-ফল হইতে বিশ্বাস জন্মে, আবার কখন বা

* জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পূর্ণিয়া-সাহিত্য-সম্মিলনীতে পঠিত।

বিশ্বাস হইতে কার্য্য প্রসূত হয়। সে হিসাবে বিশ্বাসকে পরস্পর-সংযুক্ত-ধর্ম্মাক্রান্ত (Co-relative) বলা যাইতে পারে। আমাদের শাস্ত্রেও বোধ হয় এই জন্যই, "বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি" বলিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে বিশ্বাস যে ধর্ম্মের মূল, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। অতএব ধর্ম্ম মানিতে হইলে, প্রথমেই বিশ্বাস মানিতে হইবে। ধর্ম্ম এবং বিশ্বাস এতদুভয়ের মধ্যে এমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত কেন, তাহা বুঝিতে হইলে, ধর্ম্ম কি, তাহাও অবগত হওয়া আবশ্যক। ধৃ-ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে ম-প্রত্যয় দ্বারা ধর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা ধরা; অতএব যাহা ধরিবার বা ধারণীয়, অথবা জীবকুল যাহা ধারণ করিয়া স্থির হইয়া আছে, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যায় আরও অনেক প্রকার উক্তি আছে; তন্মধ্যে জ্ঞানবাদমতে "মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম্ম।" ধর্ম্মের এই শেষোক্ত অর্থ অতি কঠিন সত্য। ধর্ম্মের প্রথমোক্ত ধাত্বর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে যে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া জীব এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে পারে না। সমগ্র জীবকুল একই ধর্ম্মপ্রভাবে ধরাধামে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু মানবজাতি, জীবপর্য্যায়ে এক হইলেও, এবং আহার নিদ্রা মৈথুন প্রভৃতি একই সাধারণ ধর্ম্মনিয়ন্ত্রিত হইলেও একমাত্র জ্ঞানবলে মানবেতর জীব হইতে সম্পূর্ণরূপে আপন স্বাতন্ত্র্য এবং বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া জীবজগতে শ্রেষ্ঠপদবাচ্য হইয়াছে। ক্ষুধা পাইলে খাইতে হয়, এ সাধারণ জ্ঞান সর্ব্বজীবেরই আছে, মানবেরও আছে। মানবেতর জাতি খাদ্যদ্রব্য অপক্কাবস্থায় ভক্ষণ করে, কিন্তু মানব তাহা করে না; সে উন্নত জ্ঞান-প্রভাবে সেই একই আহার্য্য নানা উপায়ে অবস্থান্তরিত করিয়া, রসনা-পরিতৃপ্তিকর করিয়া লয়। মানবের ঈদৃশ জ্ঞানই কি তাহাকে জীব-জগতে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিয়াছে? ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ সাধারণ ধর্ম্মসাধন সকল জীবেই করিয়া থাকে, তাহা হইলে মানবের মানবত্ব কোথায়! মানবে আর পশুতে প্রভেদ কই? প্রভেদ আছে—যে ত্রিবিধ কর্ম্ম মানব এবং তদিতর জাতি কর্তৃক সমভাবে অবলম্বিত, উহা সর্ব্বজীবের সাধারণ ধর্ম্ম; তাহা ব্যতীত যাহা, তাহাই মানবের "স্বধর্ম্ম॥" এই স্বধর্ম্ম অর্থে কোন জাতি বা দেশ অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম নহে, উহা সমগ্র মানবজাতির ধর্ম্ম। "স্ব" শব্দে আত্মাকে বুঝায়, অতএব স্বধর্ম্ম অর্থে আত্মধর্ম্ম; সে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে, আত্মার আধারভূত এই দেহ অগ্রেই রক্ষণীয়। চলিত কথায় আছে, "আত্ম রেখে ধর্ম্ম," সেই আপনাকে রাখিতে বা জানিতে হইলে, ঐহিক স্বচ্ছন্দতা (বিলাসিতা নহে) আবশ্যক, তাহাও বুঝিতে পারি; কিন্তু বুঝি না কেন আমরা ধর্ম্মের নামে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করি? ভগবান বলিয়াছেন

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥"
গীতা, ৩য় অঃ ৩৫ শ্লোক।

এই ভগবদুক্তির সাধারণ অর্থে বুঝা যায় যে, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা আপন ধর্ম্ম সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠিত না হইলেও, তাহাতে মঙ্গল হয়। ভয়াবহ পরধর্ম্ম অপেক্ষা নিজ ধর্ম্মে মৃত্যুও কল্যাণপ্রদ।

জ্ঞানবাদ্ ধর্ম্মশব্দের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পাইয়াছি—পরমাত্মার প্রতি যাহাতে ভক্তি জন্মায়, তাহাই ধর্ম্ম। "স্বধর্ম্ম" অর্থে আত্ম-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, তাহাও পাইয়াছি। জীবাত্মার প্রতি লক্ষ্যই স্বধর্ম্মের গূঢ়ার্থ এবং সেই সূত্রে 'পরধর্ম্ম' অর্থে অন্য জাতি বা দেশ বা সম্প্রদায় নহে, উহা পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। এজন্য পরধর্ম্ম অর্থে পরমাত্মা সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জ্ঞানবাদের কথা যদি মানিতে হয়, তবে উক্ত ভগবদ্বাক্যের অর্থ অন্যরূপ হইয়া পড়ে অর্থাৎ পরমাত্মা সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হওয়াও মঙ্গলকর; কারণ, পরমাত্মা-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম, যাহা জীবাত্মাকে না জানিলে হয় না, তাহা অগ্রে অনুষ্ঠিত হইলে, নিশ্চয়ই ভয়প্রদ হয়। বৃক্ষে আরোহণ না করিলে ফলপ্রাপ্তি ঘটে না। কিন্তু অর্জ্জুন কতকটা সেই রকম আশা করিয়াছিলেন। তিনি অধর্ম্মভয়ে ধর্ম্মযুদ্ধ ত্যাগ করিয়া, যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ উপদেশ দ্বারা তাঁহার ভ্রম বুঝাইয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন। তাঁহার উক্ত বাক্যও যে অভ্রান্ত, তাহাও অর্জ্জুনকে দিয়াই প্রতিপন্ন করেন। তিনি বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলে, ভগবান্ তাঁহাকে সেই রূপের একাংশ মাত্র প্রদর্শন করেন; অর্জ্জুন তখন ভয়ে বিহ্বল হইয়া বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুর রক্ষা কর, আমাকে তোমার সেই পূর্ব্বেকার সৌম্য-মূর্ত্তি প্রদর্শন কর।" আমার বোধ হয়, ধর্ম্মের নামে আমাদের ভয়ের কারণ আর কিছুই নহে—কেবল একলম্ফে সাগর পার হইয়া সীতাদেবীর সংবাদ আনিতে সমর্থ নহি—সেইজন্য। কি হইলে যে সীতা তত্ত্ব আনিতে পারি, তাহা আমরা ভাবিয়াছি কি? বক্ষ চিরিয়া শ্রীরাম সীতার যুগলমূর্ত্তি দেখাইতে আমাদের সাধ্য হয় কি? যদি আপনাকে সেইরূপে জানিতে পারিয়া থাকি, ভালই, নতুবা আগে সেই জীবাত্মাকে ভালবাসিয়া আত্মসমর্পন করি; তার পর জ্ঞান-বাদের বাক্যানুসারে সেই পরের ধর্ম্ম পরাৎপর পরমাত্মাকে ভালবাসিয়া, আত্মপর অভেদ হইয়া অনন্ত মিলন-রসের যেন অধিকারী হই।

বক্তব্য বিষয়ের সহিত প্রস্তুত বিষয়ের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলেও, পরোক্ষ সম্বন্ধ আছে। আমাদের অতীত-পূজার উদ্দেশ্য— সকল মানবেরই সাধারণ জীবধর্ম্মের সংযত ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিয়া, পরিশেষে মানবদেহধারণের সাফল্যজ্ঞাপক

জ্ঞানপ্রাপ্তি এবং সেই জ্ঞানের শেষ পরিণতি জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার পরম মিলন মহাযোগ সমাধি হেতু। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা-পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, ছন্দঃ এবং অলঙ্কার প্রভৃতি সকলই এক-তানে পরম মিলন-রস-সঙ্গীতে আমাদিগকে সেই মিলন-পথের পথিক হইতে আহ্বান করিতেছে। অতীত-নির্দ্দিষ্ট সে পথে চলিতে হইলে যে সংযম বা ধৈর্য্য এবং সময় আবশ্যক, মানবের কি তাহা নাই? অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার সেই সময় সেই ধৈর্য্য থাকা সত্ত্বেও সে, সংযম এবং সময়াভাবের অভিযোগ আনিয়া, "অবিদ্যা-সম্ভূত "সংশয়"-রাশিকে হৃদয়মধ্যে পোষণ করত আত্ম-বিজ্ঞানের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে বিরত হয় না। আমাদের অতীত আদর্শ মানবের সেই সংযম সেই সময় সুপথে চালিত করিয়া, মানবকে প্রকৃত মানব হইতে উপদেশ দেয়। অতীত বলে,—"হে বর্ত্তমান শিশু! অবিদ্যারূপ আবর্জ্জনা-রাশি ধুইয়া মুছিয়া ফেল, যদি বলের আবশ্যকতা থাকে, আমি তোমাকে কর্ম্ম রূপ মহাবল প্রদান করিতেছি। সেই বলে, জ্ঞানরূপ যৌবনে আপন অঙ্গ সুশোভিত কর এবং পরিশেষে যৌবনদৃপ্ত-কলেবরে নিশ্চিন্তহৃদয়ে সেই ভবিষ্যৎ মহামিলনের পথে অগ্রসর হও।" অতীতের এই প্রাণপ্রদ শিক্ষায় এই মিলনরস-ভঙ্গিমা উপলব্ধি করিয়াই কোনও বর্ত্তমান কবি উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিয়াছেন,—"অতীত-গৌরব-গীতি কুলুকুলু গাহে তরঙ্গিণী"; আমি জিজ্ঞাসা করি, উক্ত বাক্য কি শুধু ভাবপ্রবণ হৃদয়ের কাল্পনিক উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি? না, উহার মধ্যে কোন অবিনশ্বর সুমহৎ সরল সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত? কেহ আমার এ প্রশ্নের উত্তর না দিলেও আজিকার এই দিন—যাহা নৈসর্গিক আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আমাদের সম্মুখে উপস্থিত—তিথি মাস ঋতু বর্ষ অতীত হইয়াছে,—শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করিয়াছে, কালের নিভৃত অঙ্কে যুগ যুগান্তর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে—কত ধর্ম্ম এবং রাষ্ট্রবিপ্লব ভারতবক্ষে বহিয়া গিয়াছে—বলিতে হইবে কি একমাত্র নিত্য মাধুর্য্যময় অতীতের সজীব মহৎ সত্যের প্রাণপ্রদ পীযূষধারা সেই ভারতে—জীবন-শক্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া এখনও কবি-বাক্যের সাফল্য জ্ঞাপন করিতেছে! অতীত যেন কোন অগম্য যবনিকার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বিস্মৃতি-সুষুপ্তি হইতে জাগাইবার জন্য সুখশয্যাশায়ী নিদ্রালু প্রাণে দূরাগত নিশীথ-বাঁশরী-সঙ্গীত ঢালিয়া, অথবা নব দিবার প্রথম আলোক-রশ্মি ফুটাইয়া, নব আশা নব বল নবোদ্যম নবপ্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া বলিতেছে,—"বর্ত্তমান অতীতের শিশু।" সেখানে বিচার নাই, বিতর্ক নাই মীমাংসা নাই; শোক নাই, হর্ষ নাই, অবসাদ নাই, অশ্রু নাই, হাসি নাই, অথচ সরল সত্যের গুরু গম্ভীর ঘোষণা আছে। আজিকার স্মৃতিথি সেই সত্য কি ভাবে প্রমাণিত করিতেছে, তাহা

আমাদের বলিয়া দিতে হইবে না। আর্য্য-ভূমির প্রতিনগরে, প্রতিগ্রামে, প্রতি পল্লীতে, প্রতিগৃহে, প্রতিহৃদয়ে যদি অন্বেষণ করি, কি দেখিব? দেখিব, অতীতের লুপ্ত ছবি আজ গৃহে গৃহে হৃদয়ে হৃদয়ে সজীব বর্ত্তমান! নিন্দক-বদন এজন্য আমাদিগকে অতীত-পূজকরূপে অভিহিত করিলেও, তাহা সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়। কারণ, মানব যাহাতে পশুত্ব ছাড়াইয়া জীবজগতের সর্ব্বোচ্চ পদবী—মানবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়, আমাদের অতীত তাহাই উপদেশ দেয়। (ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং আমার বক্তব্য বিষয়ের সম্বন্ধ এইখানে।) বাস্তবিকই কি আমরা বর্ত্তমানের জন্ত অতীতের পূজা করি? না। কবির ভাষায় বলিতে হইলে, আমাদের "লক্ষ্য ভবিষ্যতে"। অনন্ত অতীতের তুলনায় "বর্ত্তমান" বালক মাত্র। সরল শিশু "বর্ত্তমান" অতীত-নির্দ্দেশিত পন্থার অনুসরণে "ভবিষ্যৎ" গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইতে সমর্থ, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

প্রসঙ্গতঃ একটি গল্পের অবতারণা করিতেছি। কথিত আছে, বঙ্গের কোন পল্লীগ্রামে এক ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদি সহ বাস করিতেন। গৃহে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহমূর্ত্তির নিত্যসেবার ব্যবস্থা ছিল। একদা নিমন্ত্রণ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের গ্রামান্তরে গমনের প্রয়োজন হইলে, গৃহ দেবতার নিত্যসেবার বিঘ্নভয়ে ব্রাহ্মণের মহাচিন্তার কারণ উপস্থিত হয়। একদিকে সামাজিক প্রথানুসারে নিমন্ত্রণ রক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় অপর পক্ষে দেবসেবার বিঘ্নভয়। ব্রাহ্মণের পত্নী কহিলেন,—প্রতিবাসী কোন ব্রাহ্মণের দ্বারা দুই চারি দিন দেবসেবা চালাইয়া লইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহা মনে ধরিল না। পরিশেষে ব্রাহ্মণ কি ভাবিয়া, স্বীয় বালক পুত্রকে বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিমন্ত্রণ-রক্ষায় গমন করিলেন। ক্রমে পূজার সময়ে ব্রাহ্মণবালক পিতৃনিদেশ অনুসারে পূজা শেষ করিলে, বালকের মাতা আসিয়া, দেবতার ভোগের জন্ত অন্নব্যঞ্জনাদি শ্রীবিগ্রহসমীপে সন্নিবেশিত করিয়া অন্তরালে গমন করিলেন। বালকও প্রথানুযায়ী মন্দির-দ্বার রোধ করিয়া বিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভোজ্যাদি নিবেদনান্তর দেখিল, তৎসমস্তই সমভাবে বিদ্যমান, দেবতা কিছুই ভক্ষণ করেন নাই। বালকের ভয় হইল, বুঝি বা তাহার কোন ভ্রমবশতঃ ঠাকুরের আহার হয় নাই। উদ্বিগ্ন অন্তরে বালক পুনরায় পূজায় বসিল, পুনরায় বিশেষ সাবধানে আহার্য্য উৎসর্গ করিল, কিন্তু ঠাকুর খাইলেন না। বালকের দৃঢ় সরল বিশ্বাস ছিল—দেবতা ভক্ষণ করিলে, অবশিষ্ট প্রসাদ সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তৎপূর্ব্বে কেহ জল গ্রহণ করেন না। এখন ঠাকুর যদি আহার না করেন, তবে কাহারও প্রসাদ পাইবার আশা নাই, সুতরাং কেহই খাইতে পাইবেন না। এই নিদারুণ ধারণা বাল হৃদয়ে অতি

নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া, সে কোমল কম্পিত উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বালকোচিত ভাষায় কহিতে লাগিল,—"হে ঠাকুর, তুমি কেন খাইবে না বল। আমার পূজার দোষ হইয়া থাকিলে, তাও আমায় বল। আমায় শিখাইয়া দাও, কিরূপে তোমার পূজা করিতে হয়।" ঠাকুর নিরুত্তর। বালক আবার বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর, তুমি খাও, নহিলে পিতা শুনিয়া আমায় কত তিরস্কার এবং প্রহার করিবেন।" ঠাকুর তথাপি নিরুত্তর। বালক আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বিগ্রহমূর্ত্তির পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। সেই ভাবে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। ক্রমে বেলা অবসান প্রায়। ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট বালক পুনরায় কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—"হে ঠাকুর বেলা যে গেল, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, তোমার প্রসাদ না পাইলে যে আমার খাওয়া হইবে না।" এই শেষোক্ত মর্ম্মান্তিক বাক্যে, বালকের বোধ হইল, যেন সেই অচল পাষাণ-বিগ্রহ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সে দেখিতে পাইল, এবার তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় নাই। তাহার দর্শনেন্দ্রিয় তাহাকে দেখাইল যে, তাহার আরাধ্য দেবতার অলৌকিক রূপের বিভায় দশদিক্ আলোকিত, বৈজয়ন্তী-সৌরভে দেব-মন্দির পরিপূর্ণ, ফুল্লাধরে মৃদু হাস্যের ছটা। বালক আহ্লাদে গদগদ হইয়া, সেই শ্রী-মূর্ত্তির দিকে নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহার আহার প্রবৃত্তি বিদূরিত হইয়া গেল। বালকের পরিণামে কি হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও কৌতূহল থাকা সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় যাহা হইবার, তাহাই হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। অধুনা সে বালক নাই বা তাহার বংশীয় কেহ আছে কি না, তাহাও জানা যায় না, কিন্তু সেই অতীত কাহিনী এবং সচ্চিদানন্দময় পূর্ণ শ্রীবিগ্রহমূর্ত্তি এখনও বর্ত্তমান!

আমাদিগের পুরাবৃত্তে এইরূপ সরল বিশ্বাসের সত্য উদাহরণ যে ভূরি ভূরি বিদ্যমান আছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যে দেশে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব মাতৃবাক্যে শ্রীহরির অনুসন্ধানে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল কাননকান্তারে, গিরিগুহায়, সরিৎসাগরে, ভয়বিরহিতপ্রাণে অদম্য উৎসাহে "কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি" বলিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে দেশের পুরাণগাথা—বালক প্রহ্লাদের 'হরি' বলিয়া অনলে আত্মাহুতি, 'হরি বোল হরি' বলিয়া মদমত্ত দুর্দ্দান্ত হস্তীর পদতলে পতন, মুখে 'শ্রীরাম'-নাম মাত্র লইয়া হস্ত-পদ-বদ্ধ অবস্থায় বক্ষে গুরুভার শিলা সহ তরঙ্গ-বিক্ষোভিত অগাধ সমুদ্র-সলিলে নিমজ্জন এবং কারাগারে "শ্রী-গোবিন্দায় নমঃ" বলিয়া বিষান্ন ভক্ষণ প্রভৃতি—সরল বিশ্বাসের পবিত্র গীত-সমূহের দিগন্তপ্লাবী কল্লোচ্ছ্বাসে অনন্ত-কাল পরিপূর্ণ রহিয়াছে, সে দেশে উক্ত গল্প নূতন না হইলেও, উপেক্ষণীয় নহে।

বিবৃত আখ্যায়িকা সত্য বা মিথ্যা হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি, অনন্ত কালের তুলনায় বর্ত্তমানের 'আমরা' শিশুমাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বিবৃত গল্পে এইমাত্র পাইয়াছি যে, এক বালক সরল বিশ্বাস বলে যোগিজন দুর্ল ভ, শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত রাতুল চরণের অধিকারী হইয়াছিল। প্রণিধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, সেই সরল বিশ্বাসের মূল কোথায়? আমি বলিব, উহা আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রে—যাহা, অতীত হইলেও বর্ত্তমানে বালক-স্বভাব-সুলভ বিশ্বস্ত-হৃদয়ে গ্রহণ করিলে, ভবিষ্যতে অর্থাৎ জীবনান্তে নহে—জীবিতাবস্থায়ই আমাদিগকে সেই অতুল মিলনানন্দ রসের অধিকারী করে। আধুনিক উন্নতির আলোকপ্রাপ্ত নবাভিধানে সেই সরল বিশ্বাস নামান্তরিত হইয়া অন্ধবিশ্বাসরূপে পরিগণিত হইলেও, তদুভয়ের কার্য্যফল বা সার্থকতা তুল্যরূপ; তাহাতে সংশয়ের কোন কারণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। অঙ্কশাস্ত্রানুসারে ব্যষ্টিযোগে সমষ্টির উৎপত্তি—এ বিশ্বাস আমার হইতে পারে। কিন্তু হায়! যে মহা সমষ্টি হইতে বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমরা ব্যষ্টিরূপে তাঁহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ ঘোষণা করিতেছি—তাহাই বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে শাস্ত্র সেই পরম যোগে আমাদিগকে অনুরাগী হইতে প্রবৃত্তি জন্মায়, কালবশে তাহাই অনাদৃত এবং উপেক্ষণীয়। ভোগবিলাসের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনুকূল বিশ্বাসের অনুরাগী হইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু সেই বিশ্বাসই ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে অন্ধ হইয়া পড়ে, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্মাধিকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথায় অর্থি-প্রত্যর্থিগণ নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষার জন্য বিচারপ্রার্থী হইলে, ব্যবহারাজীবগণ অতীত মীমাংসিত আদর্শ বর্ত্তমান বিচার্য্যবিষয়ে প্রয়োগ করিয়া ঈপ্সিত ফললাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন এবং নবীন উভয় কালেই অতীত আদর্শে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, ভবিষ্যতে তদনুরূপ ফল লাভ হয়, চিরন্তন বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, সুকুমারমতি বালকদিগের ভবিষ্যৎ চরিত্র গঠনের জন্য অতীত সাধু মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মদর্শিগণ হয় ত বলিবেন যে, ঐহিক হিতকল্পে যাহা প্রযোজ্য, পারত্রিক মঙ্গলে তাহা সম-ফল-প্রসূ না হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, একই নীতি, বিষয়ভেদে প্রযুক্ত হইলে ভিন্নফলপ্রসবিনী হইবে, এরূপ উক্তি কি নিতান্ত অসার নয়? আমাদিগের ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলই কি পরস্পর তুল্যরূপে সংশ্লিষ্ট নহে? দেহের অবসানের সহিত আমাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য-সমুদয় কি মহাকালের অনন্ত তিমির-গর্ভে যুগপৎ অন্তর্হিত

হইয়া যায়? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? যিনি জননীরূপে বক্ষঃস্থ পীযূষধারা সেচনে আমাদিগের বর্দ্ধন, পিতারূপে অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে পালন, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু এবং আত্মীয় স্বজনরূপে হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন, গুরুরূপে জ্ঞানোপদেশ দ্বারা চিত্তোৎকর্ষ সাধন করিতেছেন, এক-বাক্যে যিনি আমাদের ঐহিক জীবনের সমুদয় কার্য্যাবলীর মধ্যে, সমগ্র ইন্দ্রিয়-নিচয়ে, বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেকাদি সদ্বৃত্তিসমূহে ওতপ্রোতভাবে চিরবিরাজিত, সেই পরম প্রেমময় পরমপুরুষ,—তাঁহার সাধের সন্তান তাঁহার নিকটে যাইতে চাহিলে, তাহার বনবাস-ব্যবস্থা করিবেন, ইহাও কি কখন সম্ভব? না—কখনও না—তিনি ত বলিয়াছেন,—"কর্ম্ম কর, 'কর্ত্তব্য' বুদ্ধিতে কর্ম্ম কর, তোমার ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়ই আমি।" সে কথা শুনিলাম কই? সে কথা মানিলাম কই? সে কথা বিশ্বাস করিলাম কই, 'তিনি আমার' এই ভালবাসার কথা তাঁহাকে বলিতে পারিলাম কই? ভালবেসে তাঁর কাছে যাইতে চাই কই? অধিকন্তু সর্ব্বনাশিনী রাক্ষসী অহমিকা আমায় জপাইতেছে,—'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা'। এই আত্মঘাতী মন্ত্র হইতেই আমার ও তাঁহার মধ্যে একটি বিস্তৃত ব্যবধান আনিয়া সেচ্ছায় তাঁহার নিকট হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি! একবারও ভাবি না,—তিনি দূরে নহেন—অতি নিকটে, বুঝি বা তার চেয়েও নিকটে, আরও আরও নিকটে; প্রাণে আর তাঁহাতে বুঝি প্রভেদ নাই; অথবা বুঝি তিনি প্রাণ, আমিটা দেহ; না, তাও নয়; দেহ সেই প্রাণের, নতুবা 'আমিত্বের' দুর্গন্ধ যায় না। সেই নিত্য প্রাণের ঐহিক বিলাস-ভূমি এই দেহ এবং সৃষ্ট জগতের মূলে সেই বিলাস-রস-মাধুরী ঝরঝরে নিত্য প্রবাহিত! কিন্তু হায়, তথাপি ব্যবধান ঘুচে না। সকল বুঝিয়াও, দেহের সহিত নিত্য বস্তুটির নৈকট্য সাধিত হয় না। নিত্য প্রাণের সহিত দেহের এত ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও কেন যে সে বস্তু দেহগ্রাহ্য নয়, হায়! এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে!

প্রাচীন শ্রাদ্ধবিধি-মধ্যে উক্ত হইয়াছে—

মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ,
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তমুতোষসঃ,
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা,
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমাংস্তু সূর্য্যো,
মাধ্বী গাবো ভবন্তু নঃ।

ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যতটুকু ধারণা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, জীব-জন্মের প্রত্যক্ষ দেবতা—যাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসায় অক্লান্ত আত্যন্তিক যত্নে শৈশব কৈশোর উত্তীর্ণ হইয়া, কালে আবার তাঁহাদেরই অবলম্বন হইতে পারিয়াছিলাম, কালের নিদারুণ বিধানে তাঁহাদের সহিত পার্থিব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও সে স্নেহ সে ভালবাসা সন্তানে বিস্মৃত হইতে না পারায়, অন্তরে

অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যময়ী পরমা শক্তি চিরবদ্ধ থাকিয়া যায়। তৎপ্রভাবে এবং শাস্ত্রানুশাসিত নির্দ্দিষ্ট তিথিবিশেষে গোত্র নাম প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখে পার্থিব স্থূল এবং দ্যুলোকবাসী পিতৃদেবগণের সূক্ষ্ম দেহ এতদুভয়ের মধ্যে দূর ব্যবধান ঘুচাইয়া বিচিত্র-সুখ-সামীপ্য উপস্থিত করে। স্থূল-সূক্ষ্মের সে মিলনে দেহী তখন মধুময় হইয়া, জীবনের যাহা কিছু প্রয়োজন, তৎসমস্ত মধ্যে সেই মাধুর্য্য নিবদ্ধ দেখিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। তাই উক্তি, জীব-প্রাণরক্ষাকারী অনিল মধুর মধুর প্রবাহিত হউক, বারিধিকুল মধুস্রাবী হউক, ওষধি সমূহ মধুময়তা লাভ করুক, রাত্রি মধুময়ী হউক, প্রাতঃকাল মধুময় হউক, পার্থিব রজঃকলাপ মধুমৎ হউক, পিতা মধুময় হউন, দ্যুলোক মধুময় হউক, বনস্পতিগণ মধুমান্ হউক, সূর্য্য মধুময় হউক। গাভী সকল মধুময় হউক, পরিশেষে 'ওঁ' এই প্রণব মন্ত্র দ্বারা সমস্ত চরাচর সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মধুর মধুর মধুর হউক। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আসক্তির অভাবই আমাকে আমার সেই প্রাণের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। আমি দেহকে ভাল বাসি কিন্তু যাঁহাকে লইয়া—যাঁহার অস্তিত্বে দেহের অস্তিত্ব, তাঁহাকে ভালবাসি না, তাই দূরত্ব—তাই ব্যবধান। অতীত-পূজায় এই দূরত্ব নষ্ট করিতে চাহে। কারণ, প্রাচীন ব্যবস্থাদি বিশেষতঃ নৈমিত্তিক ক্রিয়াসমূহে দৃষ্ট হয় যে, তিথিবিশেষে কার্য্যবিশেষ অনুষ্ঠিত হইলে, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়। একই বিষয় পুনঃপুনঃ আচরিত হওয়ায়, শাস্ত্র এবং অন্তরের মধ্যে অনুরাগ বা আসক্তি বদ্ধমূল হইয়া পড়ে এবং ক্রমে সেই বাক্য ও মনের অগোচর অচিন্তনীয় অখণ্ড অব্যয় বস্তু প্রকৃতপক্ষে সুগোচর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়। যাগ, যজ্ঞ, হোম ব্রত জপ ধ্যান কীর্ত্তন প্রভৃতি সমস্তই সেই আসক্তি বৃদ্ধির পরিপোষক। আজি যে শুভ তিথি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই দিন হইতে সেই আসক্তি বা অনুরাগ সিদ্ধির প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল। আজিকার এই দিন হইতে জগৎ বুঝিয়াছিল যে, এই চরাচর বিশ্বসংসার তাঁহার বিলাস ভূমি। অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড আপনা হারাইয়া 'শ্রীকৃষ্ণায় নম' বলিয়া সমস্ত কর্ম্মফল তাঁহাকে অর্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই রস তাঁহাকে আস্বাদন করাইয়া জীবজন্ম সার্থক করিতেছে। এখনও কি বলিতে হইবে, কেন আমরা অতীত ভালবাসি? শ্রুতি বলিয়াছেন, ধীবর মাছ ধরিবার জাল বিস্তার করিলে, তাহায় নিক্ষিপ্ত জাল এবং পদের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ব্যবধান রহিয়া যায় তন্মধ্যে যে সকল মৎস্য অবস্থান করে, তাহাদের যেমন জালে আবদ্ধ হইবার ভয় থাকে না, তদ্রূপ সেই পরমপুরুষরূপ ধীবর কর্ত্তৃক কালরূপ বাগুরা অহর্নিশ বিস্তৃত হইয়া, নিয়ত জীবকুলকে ধ্বংসপুরে প্রেরণ করিতেছে, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণ সমীপাগত জীবকুলের আর ভয়ের কোন কারণ থাকে না, যেহেতু তাহারা

কালভয় নিবারণ অভয় পদের সন্নিহিত। আমাদের অতীত-পূজা সর্ব্বকালে সমভাবে সেই শ্রীচরণ-সমীপে অবস্থান করিতে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষার সহিত তিথিবিশেষ রূপ অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়া বহুদিন সাপেক্ষ কার্য্য নিমেষ মধ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভাদুড়ী।

১৩১৯ ফাল্গুন, কল্পনা হইতে উদ্ধৃত।

হারানিধি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমি যে কি দেখিলাম তাহা কি বলিব। যখন আমি লীলাকে বিবাহ করি তখনও লীলা সুন্দরী ছিল, এখন এই পূর্ণ যৌবন সমাগমে সে রূপ কি অপূর্ব্ব শোভায় বিকশিত হইয়াছে। বুঝিলাম লীলাদেবী এই অধমের ভোগ-কলুষিত হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্যা! এ পাপ দেহের বায়ু লাগিলে অচিরে এ ফুল্ল নলিনী শুকাইয়া উঠিত তাই ভগবান তাঁহার এ পবিত্র কুসুমটি নিজেরই অর্ঘ্যের জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছেন। অমি অনিমেষ চক্ষুতে লীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। লীলা কিন্তু চকিতে আমার মুখের দিকে একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিল তার পর গললগ্নীকৃত বাসে আমার পায়ে প্রণাম করিল। আমি তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিতে যাইতেছিলাম কিন্তু লীলা আপনিই উঠিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল "বিধাতা আমার প্রতি অত্যন্ত সদয়, আমি তোমরই খোঁজে হরিদাস দাদাকে পাঠাইতে ছিলাম কিন্তু তিনি আমার দুয়ারেই তোমাকেই আনিয়া দিলেন। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে।"

"কি কথা শীঘ্র বল, লীলা! আমার বিপদের কথা জানতো, অধিকক্ষণ আমার অপেক্ষা করিবার যো নাই। সেই ফুল শয্যার পর এই দেখা, কিন্তু লীলা! আমাদের মিলনেই বিধাতার অভিসম্পাত আছে, দুই বারেই ভীষণ মনোকষ্টে দেখা হইল।

"তোমার পত্রে আমি গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত সংবাদ পাইয়াছি। পরে প্রায় এক সপ্তাহ তোমার পত্র না পাইয়াই নিতান্ত বিপদ আশঙ্কায় এখানে চলিয়া আসিয়াছি। যোগেশ বাবুর খুড়তুতো ভাইয়ের এই বাসা, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সকলেই এখানে আছেন বলিয়া আর দিদির আসা আবশ্যক হয় নাই। তাঁহাকে আসিতে হইলে আমার এত শীঘ্র আসা হইত না। সে কথা যাক্, তোমার চিঠিতে আমি তোমাদের অর্থাভাবের সন্দেহ করিয়া ছিলাম, সেটা সত্য কিনা জানিতে চাই।"

বড়দাদার সেইরূপ শয্যাশায়ী মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল, সজল নয়নে বলিলাম, লীলা! দাদার জীবন সঙ্কট, অর্থাভাবে বুঝি চিকিৎসাটিও বন্ধ করিতে হইবে, আমি

পথে পথে সেই চিন্তাতেই বেড়াইতে-ছিলাম।”

লীলা তখন হাঁটু গাড়িয়া আমার পায়ের কাছে বসিল, তার পর অঞ্চল হইতে এক তাড়া নোট খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া বলিল “প্রাণাধিক! তোমার দাসী তোমার কোনও কাজে লাগে নাই, এ তোমারই অর্থ, তোমার চরণে ইহা উৎসর্গ করে তোমার দাসীকে আজ কৃতার্থ হতে দাও!”

আমার চক্ষু তখন বাষ্পে অন্ধকার দেখিতেছিল, লীলার হাত ধরিয়া বক্ষে টানিয়া লইলাম, তিন বৎসর পরে আবার আজ সেই ওষ্ঠে চুম্বন করিলাম, কি মোহ! কি তৃপ্তি! কি আবেগ! কি মাদকতা! বলিলাম “লীলা! বক্ষ হইতে কি তোমায় বিচ্ছিন্ন করা যায়।” সুখের আবেশে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল।

লীলা বিদ্যুৎ বেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইল, একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিল আজ আর দেরী করো না, ২০৲ টাকা করিয়া হাজার টাকার নোট আছে, তুমি ইচ্ছামত বড় দাদার চিকিৎসা করাও। অর্থের জন্য কোনও ভাবনা নাই।”

একবার, আর একবার মাত্র, লীলার প্রতি চাহিয়া আমি বাহিরে আসিলাম।

১২

রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া একেবারে বড় দাদার ঘরে গেলাম, রোগী অর্দ্ধ অচৈতন্য, যন্ত্রণায় অত্যন্ত অস্থির, মেজদাদা মাথার কাছে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, বৌদিদি বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতেছেন। ছেলে পিলেরা সকলেই পৃথক ঘরে মেজ বৌ দিদির জিম্মায় রহিয়াছে। আমি বৌ দিদিকে হস্তসঙ্কেতে বাহিরে আনিয়া বলিলাম “বোধ হয় ঈশ্বর এবার বড়দাদার জীবন রক্ষা করিলেন, চিকিৎসার টাকা যোগাড় করিয়াছি।” বৌদিদি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন “কেমন করিয়া যোগাড় করিলে? অল্প টাকার ত ব্যাপার নয়, কত টাকার যোগাড় হইল?

“এক হাজার, পরে আবশ্যক হইলে আরও পাওয়া যাইবে” বলিয়া নোটের তাড়া বৌদিদিকে দেখাইলাম। স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ় স্বরে বৌদিদি বলিলেন, “ঠাকুরপো, বিপদে ধর্ম্মচ্যুত হ'য়োনা, টাকা না হ'লেও ভগবানের দয়ায় রোগ আরাম হয়, বল তুমি এত টাকা কোথায় পেলে।

বৌদিদির ভয় দেখিয়া আমার হাসি আসিল, আমি বলিলাম, “তোমার কি বিশ্বাস হয় বৌ দিদি! আমি টাকা চুরি করিয়া আনিয়াছি!”

“অন্য কারণে হলে বিশ্বাস হ'ত না কিন্তু আমি জানি তোমার দাদার জীবন রক্ষার জন্য তুমি সব পার।” তখনও বৌ দিদির চক্ষু জলিতে ছিল।

“না তোমার সে ভয় নাই, বল দেখি আমাদের এ বিপদে কে সাহায্য করিতে পারে?”

খানিক চিন্তা করিয়া বৌদিদি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "এ জগতে ত এমন কাকেও দেখি না" আমি মৃদু স্বরে বলিলাম "তোমার হতভাগিনী বোন, লীলা।"

বৌদিদি দাঁড়াইয়া ছিলেন বসিয়া পড়িলেন, দর দর ধারে চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল, বলিলেন "ঠাকুরপো! সেই লক্ষীর শাপে আমার সংসার ভস্ম হইতে বসিয়াছে, যদি আমি দিন পাই এক দিকে জগৎ সংসার, আর এক দিকে আমার লীলাকে করিব, ওঁকে যদি আবার ফিরে পাই জানিব সে কেবল লীলারই জন্য।"

প্রাতে উঠিয়া বাবার কাছে যাইতেই বাবা ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন "শরৎ বিনা চিকিৎসায় নলিন আমার চলে যায়, টাকার কোনও উপায় হইল না।"

বাবার কথায় আমার চক্ষে জল আসিল। প্রথমে আমার কথা বাহির হইল না, একটু সামলাইয়া বলিলাম "না বাবা ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। আমি টাকার যোগাড় করিয়াছি।

"কত টাকা শরৎ—

এখন ১০০০৲, প্রয়োজন হইলে আরও, পাওয়া যাইবে। কথাটা বলিতে গলাটা একটু কাঁপিল, বাবার কাছে সে টুকু গোপন রহিল না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "শরৎ আমি জানি তুমি আমার সহিত পরিহাস করিবে না, কিন্তু এই বিদেশে বিনা বন্ধকে এত টাকা তুমি কোথায় পাইলে? যদি বহরমপুর হইত বা যোগেন বাবু কলিকাতায় থাকিতেন তবে আমি সন্দেহ করিতাম না। তুমি তাঁহাদের নিকট হইতে এ টাকা আনিয়াছ তাহা সম্ভব নহে, অথচ এত টাকা তোমায় কে দিল জানিতে চাই"

কথা আর বাহির হইতে চায় না, কিন্তু বাবার কথার উত্তর দেওয়া চাই, তাই কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, আমার স্ত্রী কলিকাতায় আসিয়াছে।"

"তাই জানিতে পারিয়াই, তুমি তাঁহার নিকট টাকার জন্য দৌড়িয়াছিলে?"

"আমি যাই নাই, চাইও নাই, রাস্তা হইতে লোক দিয়া আমায় ডাকাইয়া অনেক মিনতি করিয়া এই টাকা দিয়াছে।"

"কত সুদ ধার্য্য করিয়াছ?

"সুদ বা পরিশোধের কথা কিছু বলি নাই।"

"ধিক শরৎ! যাহাকে তুমি গ্রহণ করিতে পার নাই তাহার অর্থে তুমি কোন স্বত্বে দাবী রাখ। আমি প্রাচীন প্রথার অনুগামী লোক, সমাজকে অত্যন্ত ভয় করি, সেই জন্য জানিয়া শুনিয়াও স্বর্ণ সীতাকে গৃহহীন করিয়া রাখিয়াছি। বুঝি সেই পাপেরই আজ এই প্রতিফল। কিন্তু তাই বলিয়া আমি পিশাচ নই, শরৎ এ টাকা আমি ঋণের স্বত্বে ভিন্ন গ্রহণ করিতে পারি না।"

সহসা গৃহে এক নারী মূর্ত্তির আবির্ভাব

হইল। বুঝিলাম এ লীলা, আমি সেখান হইতে উঠিয়া একটু অন্তরালে গেলাম, লীলা সহসা বাবার নিকট কেন আসিয়াছে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহল হইল। লীলা বাবার চরণে প্রণতা হইয়া বলিল "ইহাতে ক্ষতি কি বাবা! সমাজ ভয়ে আপনি আমায় গৃহে স্থান দেন নাই, তাই বলে কি অন্তরের স্নেহের দাবীও আমি করিতে পারিব না? বাবা, সাক্ষাৎভাবে চরণ সেবায় বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি এই তুচ্ছ অর্থেও যদি একটু উপকার করিতে পারি দাসীকে সে ভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না।"

বাবা মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ওঠ মা। তুমি আমার রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, আমিই অভাগা তাই এমন মায়ের কোল হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। মা তুচ্ছ অর্থ নয়, আজ তোমার অর্থে আমার নলিনের জীবন রক্ষার উপায় হইবে। তবে মা ছেলের একটা আব্দার রাখ, লোকে যেন তোমাকে কুপুত্রের মা বলিয়া গালি না দেয়, তুমি ঋণ হিসাবে আমায় টাকা দাও।" লীলা সহাস্যে উত্তর করিল" কিন্তু সুদের বোঝা চাপাইবেন না ত?"

বাবা বলিলেন, "আবা মায়ের কাছে ছেলেরা পাইয়া বসে. কিন্তু সেয়ানা মাকে ত পারিবার যো নাই মা?"

তখন লীলা আবার বাবার পায়ের কাছে মাথা নোয়াইয়া বলিল, "বাবা আমি আর একটী ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

"কি মা।"

"যতদিন বড়ঠাকুর পীড়িত থাকিবেন আমায় রোগীর সেবায় অনুমতি দান করুন, তিনি আরোগ্য হইলে আমি আবার চলিয়া যাইব।" বোধ হয় বাবার চক্ষুতে জল আসিয়াছিল, কেন না গলাটা একটু ধরা ধরা বোধ হইল। তিনি বলিলেন, "মা তুমি আজ আমার পুত্রবধূ নও, আমি দেখিতেছি স্বয়ং জগদ্ধাত্রী আমার বিপদ নাশ করিতে আসিয়াছ মা, আজ কার সাধ্য তোমায় প্রত্যাখ্যান করে।

১৩

সেই দিন হইতে লীলা তাহার দেহ, মন, অর্থ, সকলই আমাদের সংসারে উৎসর্গ করিয়া দিল। বড় বৌদিদি দিবানিশি দুঃসহ মনঃকষ্টে পীড়িত হইয়া এক রূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, বড়দাদাকে দেখা যেমন প্রয়োজন বৌদিদিকে দেখাও সেইরূপ হইয়া উঠিল, কেহ ধরিয়া স্নান আহার না করাইলে একই ভাবে সারাদিন বড় দাদার পায়ের তলাতেই বসিয়া আছেন। বালিকা হইতে বৌদিদির যে শ্বশুরের সেবা দেবসেবা অপেক্ষা অধিকতর আদরনীয় ছিল আজ বাবার খাওয়া হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেও তাঁহার মনে থাকে না। ছেলে মেয়ে গুলি ত মায়ের মুখ দেখা হইতেও বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে, একবার ভ্রমেও তাহাদের নাম মুখে আনিতে শুনি না। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া না শোয়াইলে কিছুতেই ঘুমাইতে চাহেন না।

আমরা ত বড় দাদাকে লইয়াই অস্থির মেজবৌদিদি বেচারি ছেলে পিলে ও সংসার লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল, লীলা বড় বৌদিদির ভার লইয়া পড়িল। আমি জানিতাম লীলার মানসিক গুণ অসামান্য হইলেও কার্য্যদক্ষতা কখনই তাহার নিকট প্রত্যাশা করিতে পারির না, কিন্তু আমি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ছেলে মেয়েরা আজকাল মেজ বৌদিদির অঞ্চলচ্যুত হইয়া লীলার অঞ্চল প্রান্তে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে। সমস্ত দিন ইহাদের লইয়া কাটাইয়া রাত্রিতে লীলা রোগীর শিয়রে বসে। এইবার আমার সঙ্গে তাহার খানিক কথাবার্ত্তা হয়। আমিও তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয় দেখাইয়া বসিতে দিব না, সেও আমার বিষয়ে ঐরূপ কারণ দেখাইয়া বসিতে দিবে না, আমার সাধ্যমত ঝগড়া চালাইতে ত্রুটি না হইলেও অবশেষে প্রায়ই আমাকে হারিতে হইত। তার পর লীলার প্রসাদে যখন অবসন্ন মস্তক উপাধানে ন্যস্ত করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতাম তখন লীলার যুক্তির সারবত্তা ভালরূপেই অনুভব করিতাম।

এক দিকে যেমন ঐশ্বর্য্য সেবিতা, চিরসুখ পালিতা লীলা নিজের বক্ষের রক্ত ঢালিয়া সংসারে সকলের সেবায় যেমন নিযুক্ত হইল অপর দিকে তেমন এই ভীষণ অর্থাভাবের সময় লীলার অর্থরাশি স্বর্গের পূত মন্দাকিনী ধারার মত আমাদের সকল অভাব বিদূরিত করিতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম এই সময়ে লীলা না থাকিলে আমাদিগের কি দুর্গতি হইত। সে দুর্দ্দশার কথা মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠিত। "ঈশ্বর বড়দাদাকে সুস্থ করুন, লীলার এই কঠোর তপস্যা সফল হউক" আমি সর্ব্বদা এই প্রার্থনা করিতাম।

এক মাস কাল কখনও আশা কখনও নিরাশার সহিত অবিরত সংগ্রাম করিয়া শেষে ডাক্তার একদিন বলিয়া গেলেন "আর ভয় নাই।"

গল্পে আছে যে মায়া পাহাড়ের নিম্নদেশে বহু রাজপুত্রের পাষাণ দেহ স্তূপে স্তূপে পড়িয়াছিল, রাজকন্যা ঝরণার জল ছিটাইতে সকলে জীবিত হইয়া উঠিল, আমাদেরও বুঝি তাই হইল, এই একটী কথার উপর একটী প্রলয়ের মেঘ যেন বুকের উপর হইতে সরিয়া গেল। হতাশ পরিবারের মধ্যে আবার আশা আনন্দ একটু খানি সাড়া দিল।

বড়দাদা আরোগ্য হইতেছেন ইহা অপেক্ষা আমাদের আনন্দের আর কি আছে। কিন্তু তবু বুক কেন দুর দুর করে? থাকিয়া থাকিয়া চোখ কেন জলে পুরিয়া আসে। আজ প্রায় দুই মাস আমি যে আনন্দে, যে সুখ স্বপ্নে ভোর হইয়াছিলাম সে সুখের কি অবসান হইয়া আসিতেছে? বড়দাদা আরোগ্য হইলে সত্যই কি লীলা চলিয়া যাইবে? আবার কি সংসার আমার পক্ষে অন্ধকারময় হইয়া যাইবে? হায়! এ হতভাগা তবে কি লইয়া সংসারে থাকিবে? তবে এই সুখস্বপ্ন

থাকিতে থাকিতেই হে ঈশ্বর আমার মৃত্যু হউক, আমার আর দুঃখ বহনের শক্তি নাই।

বড়দাদা যে দিন প্রথম বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন, বৌদিদি ধীরে ধীরে বাতাস করিতে ছিলেন। বাবা কাছে বসিয়া ছিলেন, আমি অনেক দিনের পরে আজ বারান্দায় ফুলের টবগুলার মাটী খুঁড়িয়া দিতেছিলাম, দেখিলাম লীলা সুরুয়ার বাটি হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বড়দাদা বাবার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "মার অভাব এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি থাকিলেও বোধ হয় এত যত্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বাবাও তেমনি হাসিয়া বলিলেন "দেখনা নলিন, মা নিজের চেহারাটী কি করিয়াছেন। তুমি জান না, কি করিয়া মা একদিকে তোমার সেবা আর একদিকে এইঃ বুড়ো ছেলে আর এত বড় সংসারের ভার বহিয়াছেন। ছোট বৌমা না থাকিলে তোমায় ফিরিয়া পাইতাম না।"

বড়দাদা ততক্ষণে সুরুয়া খাওয়া শেষ করিয়াছেন। লীলা পাত্র গুলি উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। বৌ দিদি ধীরে ধীরে বাবাকে বলিলেন "লীলা আজকাল যাওয়ার কথা উত্থাপন করিতেছে" আমি প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করিয়া বাবার উত্তরের অপেক্ষায় রহিলাম। বাবা বলিলেন "অত্যন্ত পরিশ্রমে শরীর বোধ হয় খারাপ হইয়াছে, মার একটু বিশ্রামের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।"

"না, সেজন্ম নয়, লীলা বলিতেছেন "এখন ত ইনি আরোগ্য হইয়াছেন আমি আর এখানে থাকিলে যদি কেহ কিছু বলে ?"

দেখিলাম বড়দাদাও বাবার উত্তরের অপেক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

বাবা বলিলেন "তাঁহাকে বলিও যখন তাঁহাকে ঘরে আনিয়াছিলাম তখন লোকের কথাই বড় ভাবিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আমার লীলার কাছে লোকের কথা অতি তুচ্ছ. বিধাতার বাণী হইলেও তাহা আর গ্রহণীয় নয়। লীলা শুধু আমার পুত্রবধূ নয় আমার সংসারের সাক্ষাৎ মঙ্গল রূপিনী দেবী।"

দেখিলাম বৌ দিদি কাঁদিতেছেন, বলিলেন "বাবা আপনার কথায় আজ প্রাণ পাইলাম। আজ আমাদের শূন্য মন্দিরের দেবী আবার ফিরিয়া আসিলেন।

১৫

আজ বাড়িতে বড় ধুম, ফুলের মালা, পাতা ও তোড়ায় ঘর পরিপূর্ণ। বিছানায় ফুলের মশারি, ফুলের পাখা, ফুলের মালা ছড়ান, ফুলের ত কথাই নাই। এসেন্সের ত ঢেউ খেলিয়াছে বলিলেই হয়, রজনীও তেমনি জ্যোৎস্না বিধৌতা। জানালা দিয়া শয্যার উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। আমি গৃহের আলো কমাইয়া দিয়া সেই জ্যোৎস্নার উপর দেহ ঢালিয়া দিলাম।

মনোহর ফুলের সাজে ভূষিতা লীলাকে লইয়া বৌদিদিরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। মেজ বৌদিদি বলিলেন "সেথো, ভাত

থাবি, না হাত ধোব কোথা, এতদিন তো ঘোড়ার মত দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে এসেছ আজ একটু বসবার ও ক্ষমতা নেই? বলি ওঠনা গো।" আমিও কেন ছাড়ি, বলিলাম "জানত অতি ক্ষুধায় লোক দুহাতে খায়।"

"তবে অতি দর্পে হতা লঙ্কা হয়ে যাবে, উঠ্‌বে ত ওঠ নইলে লীলাকে নিয়ে চল্লুম।"

বড় বৌদিদি স্নেহ মিশ্রিত স্বরে বলিলেন "ওঠনা ঠাকুরপো" মেজ বৌদিদির ছিল পরিহাস, বড় বৌদিদির আজ্ঞা, এবার আর এড়াবার উপায় নাই। উঠিয়া বসিলাম, তাঁহারা লীলাকে আমার পাশে বসাইয়া দিলেন, দেখিলাম বৌ দিদির চক্ষুতে স্নেহাশ্রু বিগলিত হইতেছে। গদগদ কণ্ঠে বড় বৌদিদি বলিলেন, "লীলা কেবল তোরই জন্য আমি আমার স্বামী পাইয়াছি, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এবার তোকেও তোর স্বামীর সঙ্গে মিলন করিয়া দিব। কিন্তু সে কেবল আমার অহঙ্কার করাই সার, তুই নিজের গুণে সাবিত্রীর মত আপনিই স্বামীর পায়ে স্থান পাইয়াছিস, লীলা! ঐস্থান তোর অক্ষয় হইয়া থাক এই আশীর্ব্বাদ করি।"

বড় বৌদিদি চলিয়া গেলেন, হাস্যরতা মেজ বৌদিদি যাইতে যাইতে বলিলেন "একটু বড় করে কথা ক'য়ো, ঠাকুরপো! বাহিরে থেকে যেন শুন্‌তে পাই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম "লীলা! ফুল শয্যার দিনের মত কি সাধিয়া ঘোমটা খুলাইতে হইবে?"

লীলা হাসিয়া বলিল "কতক্ষণ সাধিয়াছিলে মনে আছে?"

"আঃ আবার সে কথা, লীলা! আমাদের এই প্রথম মিলন।" লীলা বলিল "তবে আমিই বা কেন তোমার মান ভাঙ্গানর সুখ হইতে বঞ্চিত হই" বলিয়া ঘোমটা দিয়া বসিল।

"লীলা! জানত 'দেহি পদ পল্লব মুদারম্‌' কথাটি পুরুষের অনভ্যস্ত নয়, তবে তোমার মত নারী রত্নের চরণ ধরা সত্যই পরম সৌভাগ্যের কথা, লীলা! আমি বড় ভাগ্যবান।"

হায়রে বিধি! সব উল্‌টাইয়া গেল, লীলা ঘোমটা ফেলিয়া দিয়া আমার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল, বলিল "ছি, ও কি কথা? আমি তোমার চরণের রেণু, আজ তোমার চরণে পড়িয়া আমার নারী জন্ম সার্থক হইল, আমায় কেবল এইখানে স্থান দিও আর কিছু আমার প্রার্থনীয় নাই।"

কণ্ঠের হার কি লোকে চরণে ফেলিয়া রাখে। আমার বুকের নিধি বুকে তুলিয়া লইলাম। দুজনেরই ঠোঁটে হাসি, চোখে জল, পূর্ণ বুক, নির্ব্বাক অধর, পরিপূর্ণ সুখে লীলার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। এই চিরতপ্ত প্রাণ দুটির মিলন বন্ধনের প্রতি চাহিতে চাহিতে চাঁদ পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল।

সমাপ্ত।

শিখ গ্রন্থ—সুখমণি সাহিব।

বিরথী সাকত কী আরজা।
সাচ বিনা কহহোবত সুচা।
বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
মুখ আবত তাসৈ দুর্গংধ।
বিন সিমরন দিন রৈন বৃথা বিহায়।
মেঘ বিনা জিউ খেতী যায়।
গোবিন্দ ভজন বিন বৃথে সভ কাম।
জিউ কিরপন কে নিরারথ দাম।
ধংন ধংন তে জন জিন জিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ ॥৬

শাক্ত অর্থাৎ তান্ত্রিকদিগের চেষ্টা বৃথা।
সত্য বিনা কি প্রকারে পবিত্র হওয়া যায়?
অন্ধ তনু যদি নাম না করে ত বৃথা।
তাহার মুখ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়।
ভগবানের স্মরণ বিনা দিবা রাত্রি বৃথা কাটায়।
যেমন জল বিনা ক্ষেত্র শুকাইয়া যায়।
গোবিন্দ ভজন ব্যতিরেকে সকল কার্য্যই বৃথা
যেমন কৃপণের ধন নিরর্থক হইয়া থাকে।
সেই জন্যই ধন্য ধন্য যাঁর হৃদয়ে হরি নাম বাস করে।
নানক বলিতেছেন, সেই জনকে বলিহারি যাই ॥৬

রহত অবর কুছ অবর কমাবত।
মন নহী প্রীতি মুখহ গংত লাবত।
জানন হার প্রভু পরবীন।
বাহের ভেখ ন কাহূ ভীন।
অবর উপদেসৈ আপন করৈ।
আবত যাবত জনমৈ মরৈ।
জিসকৈ অন্তর বসৈ নিরংকার।
যেন তুম ভানে তিনি প্রভু যাতা।
নানক উন জন চরণ পরাতা ॥৭

মানুষ ও কাজ এ কাজ করিতেছে।
ভিতরে প্রেম নাই মুখে ভালবাসা দেখাইতেছে।
কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ প্রভু সব জানেন।
মানুষ বাহিরে ভেক লইয়াছে কিন্তু ভিতরে প্রেম নাই।
অপরকে উপদেশ দে নিজে কিছু করে না।
আসিতেছে যাইতেছে, জন্মিতেছে, মরিতেছে।
যাঁহার অন্তরে নিরহঙ্কার বাস করে
তাঁহার উপদেশে সংসার তরিয়া যায়
প্রভু তুমি যাহাদের ভাল বাস তাহারাই তোমাকে জানিতে পারে।
নানক এমন সব ভক্তের চরণে পতিত হয় ॥৭

করৌ বেনতি পারব্রহ্ম সভ জানৈ।
অপনা কিয়া আপহি মানৈ॥
আপহি আপ আপি করতা নিবেরা।
কিসৈ দূরি জনাবত কিসৈ বুঝাবত নেরা॥
উপাব সিয়ানপ সগল তে রহত।
সভ কুছ জানৈ অন্তরী রহত॥
জিসু ভাবৈ তিসু লয়ে লড়িলাই।
আন অনন্তর বহা সমাই॥
যো সেবক বিসু কিরপাকরী।
নিমখ নিমখ জপ নানক হরি ॥৮

তাঁহাকে স্তুতি কর, পরব্রহ্ম সকল জানেন
তিনি আপনার কার্য্য আপনি দেখিতেছেন।

তিনি আপনিই কর্ত্তা হইয়া সব করিতেছেন।
কাহাকেও জানান তিনি দূরে আছেন,
কাহাকেও বুঝান তিনি নিকটে।
তিনি ধূর্ত্ততা এবং কূট বুদ্ধি রহিত।
তিনিই সেই আত্মার গতি জানেন।
যাঁহার প্রতি তিনি কৃপা করেন তাঁহাকেই তিনি নিজের বশে টানিয়া লন।
তিনি সকল স্থানেই প্রবেশ করিয়া আছেন।
সেই তাঁহার সেবক যাহার প্রতি তিনি কৃপা করেন।
নানক বলিতেছেন, প্রতি নিমেষে হরি নাম জপ কর ॥৮

৬ শ্লোক।

কম ক্রোধ অরু লোভ মোহ বিনশি যাই অহংমেব।
নানক প্রভু শরণাগতী করি প্রসাদ গুরু দেব ॥১
কাম ক্রোধ লোভ মোহ এবং অহঙ্কার তাহার নষ্ট হইয়া যায়।
নানক বলিতেছেন, যাহাকে গুরুদেব কৃপা করিয়া প্রভুর শরণাগত করিয়াছেন ॥১

অষ্টপদী।

জিহ প্রসাদি ছত্তীহ অমৃত খাহি।
তিস কৌ সিমরত পরম গতি পাবহি॥
জিহ প্রসাদি বসহি সুখ মংদার।
তিসহি ভিয়াই সদা মন অংদার॥
জিহ প্রসাদি গৃহ সংগি সুখ সব বসনা।
আট পহর সিমরহে তিসু রসনা॥
জিহ প্রসাদি রংগ রস ভোগ।
নানক সদা ধ্যাইহৈ ধ্যাবন যোগ ॥১
যাঁহার প্রসাদে ছত্রিশ ব্যঞ্জন অন্ন খাইতেছ।
তাঁহাকে স্মরণ কর, পরম গতি লাভ করিবে।
যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ।
তাঁহাকে সতত মনমধ্যে ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার জন্য সকল প্রকার গৃহ সুখ রহিয়াছে।
অষ্ট প্রহর রসনাতে তাঁহাকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে সুখের ভবনে বাস করিতেছ।
নানক বলিতেছেন, সর্ব্বদা তাঁহাকে ধ্যান কর, তিনি ধ্যানের যোগ্য ॥১
যিহ প্রসাদি পাট পটংবর হইবহি।
তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি॥
জিহ প্রসাদি সুখি সেজ সোইজৈ।
মন আট পহর তাকা যশ গাবীজৈ॥
জিহ প্রসাদি তুঝ সব কোউ মানৈ।
মুখি তা কো যশ রসন বখানৈ॥
জিহ প্রসাদি তেরো রহতা ধর্ম্ম।
মন সদা ধ্যাই কেবল পার ব্রহ্ম॥
প্রভুজী জপত দরগহ মান পাবহি।
নানক পতিসেতী ঘর যাবহি ॥২
যাঁহার প্রসাদে রেশমের বস্ত্র পরিধান করিতেছ,
তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কি বিষয়ের জন্য লোভ করিতেছ?
যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যাতে নিদ্রা যাও,
হে মন তাঁহার যশ অষ্ট প্রহর গান কর।

যাঁহার প্রসাদে তোমাকে সকলে মান্ত করে,
তাঁহার যশ মুখ ও রসনা ব্যাখ্যান করুক।
যাঁহার প্রসাদে তোমার ধর্ম্ম হইয়া থাকে,
হে মন, সেই পরব্রহ্মকে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
প্রভুর নাম জপ করিলে তাঁহার দ্বারে সম্মান পাইবে।
নানক বলিতেছেন, সম্মানের সহিত তাঁহার গৃহে যাইবে ॥২

যিহ প্রসাদি আরোগ কংচন দেহী।
লিব লাবহু তিসু রাম সনেহী ॥
জিহ প্রসাদি তেরা ওলা রহত।
মন সুখ পাবহি হরি হরি যশু কহত ॥
যিহ প্রসাদি তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে।
মন শরনী পরু ঠাকুর প্রভু তাকৈ ॥
জিহ প্রসাদি তুঝ কোন পহুঁচে।
মন শাসি শাসি সিমরহু প্রভু উচে ॥
যিহ প্রসাদি পাই দুর্লভ দেহ।
নানক তাকী ভগতি করেহ ॥৩

যাঁহার প্রসাদে তোমার অরুগ্ন এবং স্বর্ণকান্তি দেহ,
হে বন্ধু, সেই রামকে হৃদয়ে ধারণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার উপর আবরণ রহিয়াছে,
হে মন, সেই হরি যশ গান করিয়া সুখ লাভ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সকল দোষ ঢাকিয়া যায়,
হে মন, সেই প্রভুর শরণাপন্ন হও।
যাঁহার প্রসাদে তোমার তুল্য কেহ হইতে পারে না,
হে মন প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে সেই উচ্চ প্রভুকে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে দুর্লভ দেহ পাইয়াছ,
নানক বলিতেছেন, তাঁহাকে ভক্তি কর ॥৩

যিহ প্রসাদি আভূষণ পহিরিজৈ।
মন তিসু সিমরত কোঁ আলস কি কৈজৈ ॥
যিহ প্রসাদি অশ্ব হস্তি অসবারী।
মন তিস প্রভুকৌ কবহুঁ ন বিসারী ॥
যিহ প্রসাদি বাগ মিলখ ধনা।
রাখু পরোহি প্রভু অপনে মনা ॥
যিন তেরী মন বনত বনাই।
উঠত বৈঠত সদা তিসহি দিয়াই ॥
তিসহি ধ্যাই যো একু অলক্ষৈ।
ইহা উহা নানক তেরী রক্ষৈ ॥৪

যাঁহার প্রসাদে সমস্ত ভূষণ পরিধান করিতেছ,
হে মন, তাঁহাকে স্মরণ করিতে আলস্য কর কেন?
যাঁহার প্রসাদে তুমি অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি পাইয়াছ,
হে মন, সেই প্রভুকে কখনও ভুলিও না।
যাঁহার প্রসাদে উদ্যান, বিষয় এবং ধন পাইয়াছ,
সেই প্রভুকে আপনার মনে বাঁধিয়া রাখ।
যিনি তোমার মনকে ক্রমে ক্রমে প্রস্তুত করিয়াছেন,
তাঁহাকে উঠিতে বসিতে সর্ব্বদা ধ্যান কর।
সেই এক অলক্ষ্য পুরুষকে ধ্যান কর,
নানক বলিতেছেন, তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয়ই রক্ষা করিবেন ॥৪

যিহ প্রসাদি করহি পুণ্য বহু দান।
মন অষ্ট প্রহর করি তিসকা ধ্যান।
যিহ প্রসাদি তূঁ আচার ব্যাহারী।
তিস প্রভুকো সাসি সাসি চিতারী।
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনুপ।
যিহ প্রসাদি তেরী নীকী জাতি।
সো প্রভু সিমরো সদা দিন রাতি।
যিহ প্রসাদি তেরী পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥৫

যাঁহার কৃপায় তুমি অনেক দান পুণ্য কর।
হে মন অষ্ট প্রহর তাঁহার ধ্যান কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার আচার ব্যবহার,
সেই প্রভুকে শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার সুন্দর রূপ,
সেই অনুপম প্রভুকে সদা স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি উত্তম জাতিতে জন্মিয়াছ।
সেই প্রভুকে রাত্রিদিন স্মরণ কর।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সম্মানিত,
নানক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদেই তাঁহার যশ গান করা যায় ॥৫

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণ নাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিসমাদ।
যিহ প্রসাদি বোলহি বোলহি অমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজে বসনা।
যিহ প্রসাদি হস্ত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সম্পূরণ ফলহি।
যিহ প্রসাদি পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজ সমাবহি।
ঐসা প্রভু ত্যাগি অবর কত লাগহু।
গুরু প্রসাদি নানক মন জাগাহু ॥৬

যাঁহার প্রসাদে কর্ণ শ্রবণ করিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে নানা প্রকার বস্তু দর্শন করিতেছ।
যাঁহার প্রসাদে রসনায় মিষ্ট কথা বলিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে সুখে শান্তিতে বাস করিতেছ,
যাঁহার প্রসাদে হস্ত পদ চলিতেছে,
যাঁহার প্রসাদে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়,
যাঁহার প্রসাদে মানব পরম গতি লাভ করে,
যাঁহার প্রসাদে সুখে ও শান্তিতে মানুষ অবস্থিতি করে,
সে প্রভুকে ছাড়িয়া অপর বস্তুতে কেন লিপ্ত হইতেছ?
নানক বলিতেছেন, গুরু প্রসাদে জাগরিত হও ॥৬

যিহ প্রসাদি তু প্রগট সংসারি।
তিস প্রভুকো মুলি ন মনহু বিসারি।
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপু।
রে মন মূঢ় তু তাকো জাপু।
যিহ প্রসাদি তেরে কারজ পূরে।
তিসহি জান মন সদা হজুরে।
যিহ প্রসাদি তু পাবহি সাচু।
রে মন তু মেরে তু তাসো রাচু।
যিহ প্রসাদি সভকি গতি হোই।
নানক জাপু জপৈ জপ সোই ॥৭

যাঁহার প্রসাদে তুমি সংসারে সম্মানিত,
সেই প্রভুকে তুমি কোন প্রকারে ভুলিও না।

যাঁহার প্রসাদে তুমি প্রতাপবান,
রে মূঢ় মন তাঁহাকে জপ কর।
যাঁহার প্রসাদে তোমার কার্য্য পূর্ণ হয়,
তাঁহাকে সর্ব্বদা মনোমধ্যে রাখিও।
যাঁহার প্রসাদে তুমি সত্য লাভ কর,
রে মন তুমি তাঁহাতেই রত থাক।
যাঁহার প্রসাদে সকলের গতি হয়,
নানক বলিতেছেন, জপ কর, তিনিই জপ
করিবার যোগ্য ॥৭

আপি জপায়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়েসু হরি গুন গাউ।
প্রভু কিরপাতে হোই প্রগাসু।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাসু।
প্রভু সুপ্রসন্ন বসৈ মন সোই।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোই।
সর্ব্ব নিধান প্রভু তেরি মায়া।
আপহু কছু ন কি নস্থ লয়া।
জিতু জিতু লাবহু তিতু লগহি হরি নাথ।
নানক ইনকৈ কছু নহি হাথ ॥৮
তিনি আপনিই মানুষকে নাম জপ করান,
আপনিই নিজের গুন গান করান।
প্রভুর কৃপাতেই জ্ঞান প্রকাশ পায়।
প্রভুর দয়াতেই হৃদয় কমল বিকাশ হয়।
যাঁহার প্রতি প্রভু সুপ্রসন্ন, তাঁহারই মন
প্রভুতে রত থাকে।
প্রভুর দয়াতেই মানুষের সুমতি হয়।
হে সর্ব্ব নিধান প্রভু, সকলই তোমার
মায়া।
তুমি নিজে কিছুই কর না বা কিছুই লও
না।
হে হরি, হে নাথ, তুমি যাহাতে লাগাও
তাহাতেই থাকি।
নানক বলিতেছেন, মানুষের কোন হাত
নাই ॥৮

(ক্রমশঃ)

ভূত না মানুষ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

১

একি? একি ইন্দ্রজাল অথবা স্বপ্ন বিভ্রাট?

আদিত্য দেবের আগমন বার্ত্তা শ্রুত হইয়া নীল সৌন্দর্য্যধারিণী নিশীথিনী গমনোদ্যত হইয়াছেন। এই কালে দেবদত্ত পুরমণ্ডল গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলেন। নন্দক তখনও তাঁহার পশ্চাতে ছিল। দেবদত্ত কৌশল ক্রমে অন্য পথ দিয়া আগমন করিয়া নন্দককে পশ্চাতে ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু নন্দকই অগ্রে পুরমণ্ডলে প্রবেশ করুক এই তাঁহার ইচ্ছা। অতএব তিনি পথ ছাড়িয়া একটী কুসুমিত বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা নন্দকের অশ্বের পদধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল।

তখন নন্দকের আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই বুঝিতে পারিয়া দেবদত্ত লতা পাতা দ্বারা বাসুকীকে বনাভ্যন্তরে বন্ধন করিয়া স্বয়ং একটী কুসুমিত পলাশ বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে নন্দক সেই কুসুমিত বন অতিক্রম করিয়া পুরমণ্ডল গ্রামে প্রবেশ করিলেন। নন্দক চলিয়া গেলেন দেখিয়া দেবদত্ত সেই নিভৃত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অশ্বারোহণে উদ্যত হইলেন।

সহসা তিনি কতকগুলি মানুষের পদ শব্দ শুনিতে পাইয়া চমকিত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন জনকতক লোক দুইটি শব দেহ বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে। অস্তমিত চন্দ্রের ক্ষীণালোকে সেই শব বাহক মনুষ্যগণ দেবদত্তকে চিনিতে পারিল। তখন তাহারা এত দ্রুত গতিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিল যে দেখিতে দেখিতে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার আর ঠিকানা রহিল না। দেবদত্ত জ্ঞান হীনের ন্যায় এতক্ষণ সেই দৃশ্য অবলোকন করিতেছিলেন। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায়! একি করিলাম, ইহাদিগকে ধৃত করিলাম না কেন? ইহারা অবশ্যই দোষী লোক, কাহাকে খুন করিয়া অথবা বাঁধিয়া লইয়া পলাইতেছে। আমি চক্ষে দেখিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিতে পারিলাম না। এইরূপ চিন্তাতিশয্যে অবসন্ন হইয়া তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন হায়! আমি কি করিলাম, কি করিলাম! গুরুতর অপরাধ করিয়া কয়েক জন লোক এইরূপে লইয়া যাইতেছে দেখিয়াও আমি তাহার প্রতিকার করিলাম না। ধিক্! আমার বাহুবলে ধিক্! আমার পুরুষত্বে ধিক্! এস বাসুকী এস আমি তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অপরাধিদিগের অন্বেষণে গমন করি। বাসুকী হ্রেষারব করিয়া উঠিল, দেবদত্ত ভাবনা চিন্তায় মগ্ন-পায়ীর ন্যায় টলিতে টলিতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অপরাধিগণ যে দিকে গমন করিয়াছিল সেই দিকে গমন করিলেন। তৎকালে উষা দেবীর আগমন হইয়াছিল এবং সুর সুন্দরী উষার রক্তিমাধর ও কপোল দেশ হইতে আলো রাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথিবীকে আলোকিত করিতেছিল। দেবদত্ত অনবরত যাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিরাম নাই, একবারও বিশ্রাম না করিয়া তিনি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক দীর্ঘ পথ অবলম্বন করিয়া ছুটিতে লাগিলেন। যখন তপন দেবের প্রখর কিরণে ধরণীতল উত্তপ্ততা প্রাপ্ত হইল, সমীরণ উষ্ণ হইয়া উঠিল, তখনও তিনি গমনে ক্ষান্ত হইলেন না। কিন্তু ক্রমে আদিত্যদেব পূর্ব্বাকাশ পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচল চূড়ে লুক্কায়িত হইলেন, সন্ধ্যার ধূসর বর্ণে ধরণী ধূসরিত হইয়া উঠিল, তখন তিনি গমনে অসমর্থ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ক্ষুদ্র এক ইষ্টকখণ্ডে উপবেশনান্তর একটা সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় তাল তরুতে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া

রহিলেন। তৎপর আলস্য বশতঃ তাঁহাকে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই ক্ষণকাল থাকিতে হইয়াছিল। এমন সময় কে এক জন তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইলেন সুবৃহৎ শিখাধারী চন্দন চর্চ্চিত ললাট, দীর্ঘ অবয়ব ও কুৎসিত উত্তরীয় কৃষ্ণ বর্ণ পরিশোভিত স্কন্ধ বিশিষ্ট একজন মানব তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দেবদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন "আপনি কে ও কি চান?"

আগন্তুক কহিলেন "আপনাকে ক্লান্ত দেখিতেছি আপনী আমার সঙ্গে আগমন করিলে ক্লান্তি দূর করিতে পারিবেন। দেবদত্ত বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। বামুকীও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। সন্ধ্যা কালের অন্ধকারে দিকদিগন্ত সমাচ্ছন্ন ছিল। তিনি সাবধানে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। পথের দুই দিকে লতাপত্র ও পুষ্পবৃক্ষ। অন্ধকারের মধ্যেও বিশদ ফুলগুলির প্রফুল্লতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মন ঐশ্বরীক ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বর বিষয়ক এই কবিতাটী আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন:—

১

জগন্নাথ! জয় যুক্ত জগত তোমার
সুখময়ী সর্ব্বরীর সুষুপ্তির কোলে
প্রকৃতি দিয়াছে ঢালি আঁধারের ভার,
হাসিছে তিমির নীরে কুসুমের দলে।

২

দূরে কত দূরে স্থিত আকাশ মণ্ডল,
তথা হতে বরষিছে নিহার সলিল
সুসজ্জিতা হইতেছে মহা মহিতল
শীতলতা লভিতেছে অনন্ত অনিল।

৩

জগন্নাথ! জয় যুক্ত প্রকৃতি তোমার
ফল পুষ্প সুপ্রসব করে নিত্য নব
কণ্ঠ ভরা হীরা সুসমা তটীনীর হার
জলধি মেখলা রূপে বাড়ায় গৌরব।

৪

কি সুন্দর কি মধুর জগন্নাথ নাম
এ নামে পাপীর প্রাণে প্রেম ধারা বয়
কোটী কণ্ঠে করে ধরা তব নাম গান
জয় জগবন্ধু! তব জয় জয় জয়।

অম্বরেতে তড়িৎ জলে নীরদের কোলে
তাহাতেও তোমারই পাই পরিচয়
বজ্র যে ভাঙ্গিয়া পড়ে নর বক্ষস্থলে
তাহাও মহিমা তব হে মহিমালয়।

৬

শিশুরা বর্দ্ধিত হয় দিবসে দিবসে
জ্ঞান পেয়ে তব নাম শুনিবারে পায়,
বৃদ্ধেরা মৃত্যুতে যায় কালের আদেশে
আত্মারূপে সেখানেও তোমাতে মিশায়।

৭

আদিতেও তুমি নাথ! অন্তেতেও তুমি
উত্তরে দক্ষিণে তুমি, তুমি মধ্য স্থলে
পূর্ব্বে পশ্চিমে তুমি, তোমাময় আমি
অধোতে, উর্দ্ধেতে, মস্তকেতে, পদতলে।

৮

অন্তরে বিরাজ কর হয়ে অন্তর্যামী
নয়নের জ্যোতি হয়ে জগত দেখাও,
দুঃখ দিয়ে শাসন করিছ পূজ্যস্বামী
জ্ঞান জবা ফুটাইয়া নিজেকে জানাও

৯

প্রণাম তোমাকে নাথ! প্রণাম তোমাকে
আজীবন করি যেন তব নাম গান
শিখাও আমাকে নাথ শিখাও আমাকে
তোমাকে সঁপিয়া দিব তব দত্ত প্রাণ।

এই কবিতাটী সমাপ্ত করিয়া দেবদত্ত উর্দ্ধমুখে ও যুক্তকরে সেই মহামহিমা-ময়কে প্রণাম করিলেন। তৎপরে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন ও মাঠ। মাঠের উপর দিয়া একটি পথ বাহির হইয়াছিল, এই পথ ধরিয়াই তাঁহারা দুই জন গমন করিতেছিলেন। ঘোর অন্ধকারে আকাশ মণ্ডল আবৃত। দেবদত্তের অন্তরে কিঞ্চিৎ ভীতির সঞ্চার হইল। চোর ডাকাইতের ভয়েই তিনি শঙ্কিত হইতে ছিলেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে সেকালে এই সব ভয়ই অত্যধিক দেখা যাইত। কিন্তু তিনি খাপবদ্ধ তীক্ষ্ণ তরবারীর উপরে হস্তক্ষেপ করিয়া মন হইতে ভয় ভাবনা বিদূরিত করিয়া দিলেন। সম্মুখে একটী গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বলিয়া বোধ হইল। সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার বিশ্রামোপযোগী সমুদয় দ্রব্য প্রাপ্ত হই-লেন। হস্তপদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক ফল মূল ও দুগ্ধ দ্বারা উদর পূর্ণ করিয়া সুশীতল শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর হটাৎ যেন তাঁহার সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। কি একটা অস্থিরতা যেন তিনি অনুভব করিতে লাগি-লেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি যেন বুঝিতে পারিলেন জনকতক লোক তাঁহাকে বন্ধন করিয়া শবাকারে মাথায় করিয়া লইয়া চলিল। তিনি আপনার তীক্ষ্ণ তরবারীর উপরে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন কিন্তু পারিলেন না, চীৎকার করিতে ইচ্ছা করিলেন তাহাও যেন তাঁহার শক্তি হইল না। তাহার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যেন তিনি একখানা নৌকার অনাবৃত কাষ্ঠের উপর শায়িত রহিয়াছেন। বহু লোক একত্র হইয়া নৌকার দাঁড় বাহিলে যেরূপ শব্দ হয় তাঁহার কর্ণে যেন সেই রূপ শব্দ আসিতে লাগিল। তখনও তাঁহার আপন তরবারি ধারণ করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু পারিলেন না। চীৎ-কার করিতেও তিনি পারিলেন না। তাহার পরেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যেন তিনি এক শিবিকা মধ্যে শায়িত হইয়া কোনও বড় পথ দিয়া নীত হইতে-ছিলেন। এই সময়েই যেন তাঁহার শ্বাস রোধ হইয়া আসিল এবং ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা তিনি দেখিতে পাইলেন শ্যামল তৃণবৃত একখানি বিস্তির্ণ মাঠের প্রান্তভাগে তিনি শায়িত রহিয়াছেন। নন্দক তাঁহার নিদ্রিত মস্তক ক্রোড়ে

করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। নন্দকের মাতা তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অধোমুখে তাঁহার চোখে মুখে জল সেচন করিতেছেন। তাঁহাকে জাগ্রত দেখিয়া তাঁহারা দুই জনে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।
খুলনা।

ক্ষুদ্রের প্রভাব।

THE POWER OF LITTLES.

এই বিশাল ভ্রামামান ও পরিদৃশ্যমান জগৎ ক্ষুদ্রের সমাবেশ মাত্র। আমরা যে দিকে নিরীক্ষণ করি, দেখিতে পাই ক্ষুদ্রেরই প্রভাব বিরাজ করিতেছে। ক্ষুদ্র একটী একটী করিয়া মহতের সৃষ্টি করিতেছে। ক্ষুদ্র শক্তিহীন নহে, ক্ষুদ্রের শক্তি আছে। জগতে দশটী ক্ষুদ্র একত্র হইলে মহৎ অতি মহৎ কার্য্য সাধন করিতে পারে। অনেকে মনে করেন এই বস্তুটী ক্ষুদ্র, ইহার ক্ষমতা কি? এই বাক্যটী সামান্য, ইহার ক্ষমতা বা মূল্য কি? এই কার্য্যটী ক্ষুদ্র, ইহার গুরুত্ব বা আবশ্যকতা কি? কিন্তু তাহা নহে, সকল ক্ষুদ্রেরই শক্তি, আবশ্যকতা ও মূল্য আছে। ঈশ্বরের প্রতি কার্য্য তাঁহার মহত্ব প্রকাশ করিতেছে।

বিন্দু বিন্দু বারিসম্পাতে অকূল প্রকাণ্ড সিন্ধু সংগঠিত হইতেছে, বিন্দু বিন্দু বারি একত্রিত হইয়া জগতের কি না হিতসাধন করিতেছে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিকণা সংমিলিত ভাবে ভূধর শিখর হইতে বহির্গত হইয়া স্রোতস্বিনী নামে ধরাতলে অবতীর্ণ হইতেছে। সেই স্রোতস্বিনী কুল কুল নাদে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে মনোহর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। জীবকুল তাহার মঙ্গলময় সমাগমে কত না উপকার লাভ করিতেছে। তাহারা তাহার জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে, তাহার আশীর্ব্বাদ রূপ ফল, ফুল, শস্য গ্রহণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছে। আকাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ একত্র হইয়া বিরাট এবং ভীষণ রূপ ধারণ করিতেছে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা দ্বারা পৃথিবী প্লাবিত করিতেছে। বারি বিন্দুর বর্ষণ পাইয়া তরুরাজি সুন্দর ফল, ফুল ও নব পত্র-পল্লবে সুশোভিত হইতেছে, প্রকৃতি ভাণ্ডার ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া বসুন্ধরাকে হাস্যময়ী করিতেছে। পুষ্করিণীতে বারি বিন্দু একত্র হইয়া তৃষা নিবারণ পূর্ব্বক জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের এই অসীম সৃষ্ট সংসার ক্ষুদ্রের সমাবেশ মাত্র। উন্নত দিগন্তব্যাপী মহীরুহ ক্ষুদ্রের সমষ্টি। দেশ, মহাদেশ

সকল ক্ষুদ্রের সম্মিলন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা সংমিলিত হইয়া ভূধর ও মহাদেশের সৃষ্টি হইয়াছে। তাই বলি ক্ষুদ্রকে তাচ্ছল্য করিবার কিছুই নাই। ক্ষুদ্র শক্তিমান, ক্ষুদ্র মূল্যবান, ক্ষুদ্র আবশ্যকতার উপযোগী, হিতকর বস্তু। তাই কবি বলিয়াছেন ;—

"Little drops of water, little
grains of sand,
Make the boundless ocean, and
the beauteous land ;
And the little moments, humble though they be,
Make the mighty ages of eternity."

"বিন্দু বিন্দু বারি করে সাগর গঠন,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালি করে নগর সৃজন,
সামান্য মুহূর্ত্তে করে হইয়া মিলন,
বলশালী অনন্ত সে কাল নিরূপণ।"

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোৎ সমবায়ে বনরাজি আলোকিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝিল্লীর ঝি ঝি গহন কানন মুখরিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসুমে উদ্যান সকল সুসজ্জিত হইয়া সুন্দর শোভা ধারণ করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষার কণা সম্পাতে গিরিরাজশিরে সুন্দর মুকুটের সৃষ্টি হইতেছে। তাহাতে সূর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রশ্মিকণাগ্রথিত কিরণমালা পতিত হইয়া কত না অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। তাই দেখিতে পাই ক্ষুদ্রের প্রভাব সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে।

কি জীবরাজ্যে কি উদ্ভিদ্‌রাজ্যে সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্রের বল ও বিক্রম দেদীপ্যমান। জীব জন্তু প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্ত, তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন জগতে স্বপ্নাতীত অদ্ভুত আবিষ্কার সকল স্বল্প স্বল্প করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আবার উক্ত আবিষ্কার সকল অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইতে সম্ভূত হইতেছে। বৃহৎ দীর্ঘকালব্যাপী মানব জীবন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টিমাত্র মানব চরিত্রও তাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য দ্বারা মানব-চরিত্র গ্রথিত। আমাদিগের চির জীবনের গৃহ সুখও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা নিচয়ের উপর নির্ভর করে। ক্ষুদ্রই আমাদিগের দৈনিক গৃহ সুখের মূল। দয়া, স্নেহ, মমতা, ভালবাসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুণসমূহ ঐ সুখের ভিত্তি ও সুব্যঞ্জক। উহাতে আমাদিগের গৃহস্থলী পবিত্র ও সুখময় স্বর্গরূপ ধারণ করে।

"Little deeds of kindness, little
words of love,
Make the earth an Eden, like
the heaven above."

"ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দয়া কার্য্য, প্রণয় বচন,
সুখ স্বর্গ করে এই অবনী ভবন।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা করে স্বভাব সৃজন,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাতে জীবন গঠন।
গৃহ মধ্যে সুখ যাহা ক্ষুদ্র কার্য্যে হয়,
ক্ষুদ্র বলে কেহ তাই ফেলিবার নয়।"

আমাদিগের এই পঞ্চ ভূতাত্মক দেহ ক্ষুদ্র হইতে উৎপন্ন, ক্ষুদ্রতে বিলুপ্ত হয়।

আমরা অল্প অল্প ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মন প্রশস্ত করিতে পারি এবং ইহ জীবনকে সুখের অধিকারী করিতে পারি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মকার্য্য আমাদিগের পরপারে যাইবার সম্বল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মকার্য্য সকলই কেবলমাত্র আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের চরণতলে লইয়া যাইতে পারগ হয়। ক্ষুদ্রের প্রভাব সর্ব্বত্রই প্রতীয়মান।

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ।

সাধু বচন সংগ্রহ।

অন্যের দুঃখের সঙ্গে করিলে তুলনা।
আপন দুঃখের ভারে গুরুত্ব থাকে না। ১
পরেতে দেখিয়া দোষ নিন্দিবে যেমন,
সাবধানে ত্যাগ তাহা করিবে তেমন। ২
নির্দ্দয় মৃত্যুর বুঝি বধির শ্রবণ,
স্তুতি মিনতির বশ নহে সে কখন। ৩
কুচিন্তায় করিওনা অন্তর কুটিল,
কু কথায় করিওনা রসনা পঙ্কিল। ৪
বিপন্ন জীবন রক্ষা করে যে প্রকারে,
সত্য রক্ষা কর সেই বিধি অনুসারে। ৫
স্বার্থ সংস্কারে তত্ত্ব রহে আচ্ছাদিত,
বিচার বিতর্ক তাই নিতান্ত উচিত। ৬
কর্ম্মঠতা আছে যার দরিদ্র 'সে' নয়,
শ্রম সহ ঐশ্বর্য্যের তুলনা না হয়। ৭
দুঃখ আর দরিদ্রতা অঙ্কুশ যুগল,
যত্ন আর পরিশ্রমে রাখিছে সবল। ৮
চিকিৎসায় যে রোগের নহে প্রতীকার।
বিদূরিত করে তারে সংযত আহার। ৯
মন্দ যার অভিসন্ধি, দুষ্ট যার মন,
তারে ছাড়ি দূর দেশে পলাবে সুজন। ১০
দুর্দ্দিনে যাহার তরে অনুতাপ হয়,
করিওনা হেন কাজ সৌভাগ্য সময়। ১১
যে জন আপন কাজে উপযুক্ত হয়,
এক দিন পুরস্কার পাবে সে নিশ্চয়। ১২
প্রভাতে যে কাজ পার রাখিও সারিয়া,
সায়াহ্নের তরে তাহা দিওনা রাখিয়া। ১৩
মন্দ পরিহরি ভাল করিবে সদাই,
মানব কর্ত্তব্য আর ইহা ছাড়া নাই। ১৪
মন্দ বলি কাহারেও করিওনা ঘৃণা,
সংশোধনে চিত্ত শুদ্ধি কাহার ঘটে না। ১৫
সকল বিপদ হ'তে প্রাণে বাঁচা যায়,
আপনার হাত হ'তে পালাবে কোথায়। ১৬
শরীর মনের স্বাস্থ্য মূলধন যার,
কোন দেশে কোন কালে কি অভাব তার ?
জানিতে বিশ্বের তত্ত্ব ব্যাকুল সবাই,
আপনার তত্ত্ব কিন্তু কারো মনে নাই। ১৮
শরীরের রোগে করে সবাই ক্রন্দন,
স্মরিয়া মনের রোগ কাঁদে কয় জন ? ১৯
বাহিরের পরিচ্ছদে বড় যত্ন যার,
ভিতরে দেখিলে তার উঠিবে ধিক্কার। ২০
উন্মিলীত চক্ষু রহে গণ্ডীর ভিতরে,
নিমীলিত চক্ষু ছুটে ব্রহ্মাণ্ডের পারে। ২১
না করিলে ইষ্ট দেবে প্রাণ সমর্পণ,
বালকের খেলা সব সাধন ভজন। ২২

মশক দংশনে হয় যে দেহ চঞ্চল,
সে কিম্বা সহিবে দীপ্ত চিতার অনল।২৩
কি ফল থাকিলে ধন কৃপণের ঘরে?
খনিস্থিত মণি কার উপকার করে? ২৪
যে মণ্ডূক চিরদিন কূপে করে বাস,
সে কেন বাসিবে ভাল বিমুক্ত বাতাস।২৫

বামারচনা।

উদাসীন দান।

১

দাও ভেঙ্গে দাও সুখের স্বপন
নিশা না হইতে ভোর,
দাও টুটি দাও প্রাণের মধুর
সুদৃঢ় প্রণয় ডোর।

২

নিভাও নিভাও আশার আলোক
শুকাও বাসনাকলি,
বিলাও বিলাও সকলি ধরায়,
যা কিছু আপনা বলি।

৩

আসিবার আগে গোধূলি আঁধার
ভাঙ্গিবার আগে মেলা,
কর সমাধান ওহে জগদীশ!
আমার জীবন খেলা।

কন্যার বিয়োগে মাতার শোকোচ্ছাস।

১

এ হেন চাঁদিমা রাতে চলে গেছ তুমি,
স্নেহ-পাশে বেঁধে রাখিতে নারিনু আমি,
কি বার্ত্তা পাইলে, কারো কথা না কহিলে,
ধ্যানযোগে মগ্ন হয়ে অনন্তে মিশিলে।

২

প্রফুল্ল-নলিনী-সম ফুটে ছিলে ঘরে,
কতই আনন্দ শান্তি দিয়েছিলে মোরে,
তোমার সঙ্গীত ধ্বনি মরমে ধ্বনিছে,
মধুর বীণায় তান নীরব হয়েছে।

৩

ভাবেতে বিভোর হয়ে বিভুর বন্দনা,
গাইতে যখন তুমি আনন্দে মগনা,
স্বর্গ মর্ত্ত ভেদাভেদ থাকিত না আর,
সবার হৃদয় থেকে ঘুরে যেতো ভার।

৪

রোগ জীর্ণ পিতা তব শোকেতে আকুল,
সান্ত্বনা না মানে হৃদি পরাণ ব্যাকুল,
তব কণ্ঠে ব্রহ্মনাম শুনিতে শুনিতে,
যাইবেন ভবপারে সাধ ছিল চিতে।

৫

মনের বাসনা সব মনেতে রহিল,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সব শূন্যেতে মিশাল,
সব সুখে সুখী হয়ে ছিলাম সংসারে,
দয়াময় নাম গানে যাব ভব পারে।

৬

ধর্ম্ম কর্ম্ম একাধারে অনুপম রূপে,
ফুটিয়া উঠিতেছিল তোমার ভিতরে,
ধনী, জ্ঞানী, দুঃখী, তাপি সর্ব্বজনে তুমি,
স্মৃতিতে অমর হয়ে স্বর্গে আছ বসি।

৭

তুমি এনেছিলে ঘরে জোছনার রাশি,
তোমার বিয়োগে অমানিশা দিবানিশি,
অমরার ফুল তুমি গেছ কোথা চলে,
বুক ভরা বেদনা যে দিয়ে মোরে গেলে।

৮

বুঝিনু সংসার নহে তব যোগ্য স্থান,
হেথায় পুরেনা আশা নাহি প্রতিদান,
তাই বুঝি চলে গেলে জীবন উষায়,
ত্যজিয়া মরত ভূমি অমর যথায়।

৯

দু দিনের তরে বাছা আসিয়ে হেথায়,
বিভু প্রেম সুধারসে ভাসালে সবায়,
তব তরে আঁখি ঝরে কত নারী নরে,
অকালে নিঠুর কাল লয়ে গেল তোরে।

১০

জীবনে যে ব্রহ্ম নাম সাধন করিলে,
মরণের কালে সবে সাক্ষ্য দিয়ে গেলে,
সে দেশ স্বদেশ তব আগে জেনে ছিলে,
দয়াময় নাম গানে জীবন ত্যজিলে।

১১

ওহে প্রভু দয়াময় কি বলিব আর,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ জীবনে আমার,
তুমি এনে ছিলে হেথা, রেখে ছিলে তারে,
অযোগ্য দেখিয়া মোরে নিলে ত্বরা করে।

১২

এবে এই ভিক্ষা প্রভু মাগি তব ঠাঁই,
তব কোলে হেরে তারে জীবন জুড়াই,
ইহ পরলোক এক করে দাও দেখি,
ঘুচে যাক্ ব্যবধান খুলে যাক্ আঁখি।

১৩

দীন দয়াময় তুমি পতিতপাবন,
শরণাগতেরে রাখ জানে সর্ব্বজন,
সযতনে শান্তি ভাবে রেখো সে আত্মায়,
দেহান্তে মিলিব মোরা গিয়ে তব পায়।

বেহুলা।

কবি-কেশরীর মানস-সম্ভবা,
প্রতিভা-শালিনী, সুষমা বৈভবা,
রাণী—মহারাণী সীমন্তিনী কুলে,
সতী-শিরোমণি বেহুলে! ১

সুধীরা সুশীলা, করুণা-রূপিণী,
দিব্য প্রেম তেজে মহা তেজস্বিনী,
অটলা, অচলা বিপদ অকূলে,
দুঃখিনী—সুখিনী বেহুলে। ২

অয়ি লীলাবতি, তব লীলা ভবে
তব কীর্ত্তি খ্যাতি চিরদিন রবে,
চির দিন কবি তব পাদমূলে
আশ্রয় লভিবে বেহুলে। ৩

পাষাণী পদ্মার নাগকুলভয়ে
সারা নিশি জাগ ব্যাকুল হৃদয়ে,
অঙ্কে লয়ে পতি চরণ রাতুলে
লৌহের বাসরে বেহুলে। ৪

অদৃষ্ট বিধানে সুপ্ত নখিন্দর,
গরজে বাহিরে কাল বিষধর,
"দুর্গা দুর্গা" বলে ডাকিলে আকুলে
তুমি ভক্তিমতী, বেহুলে। ৫

সূচাগ্র প্রমান রন্ধ্র পথে চরে
মনসার নাগ মনসার বরে,
ছিল রন্ধ্র এক কামারের ভুলে
বাসরে তোমার বেহুলে! ৬

পশিল পন্নগ, হায় হায় হায়?
এ কালের হাতে কে এবে বাঁচায়?
(তুমি) হানিলা ছুরিকা দৃঢ় করে তুলে,
নাশিলে অরাতি, বেহুলে। ৭

(তবু) বিধাতার লিপি কে করে খণ্ডন?
মনসার কোপ করে প্রশমন?
যত বিনাশিলে তুমি অহিকুলে,
তত এলো ধেয়ে, বেহুলে! ৮

কালকূট নাগ কালসহোদর,
অশরীরী পশি বাসর ভিতর
দংশিল নিঠুর শিরে কেশমূলে
নখিন্দরে তব, বেহুলে। ৯

(আহা) মুহূর্ত্তে শুকাল প্রাণ প্রস্রবণ,
কোথা সে সুন্দর দেহের বরণ
কালিমা পড়েছে বদন মণ্ডলে,
নখিন্দরের তব, বেহুলে। ১০

সহসা আতঙ্কে শিহরিল প্রাণ,
ডুবিল চন্দ্রমা, আঁধার গগন।
ঝাঁপিলে অতল বিপদ অকুলে,
শোকে বিবসনা বেহুলে। ১১

নীরব নির্জ্জন নিথর অবনী
রাক্ষসীর বেশে আসিয়া রজনী
তব প্রাণপতি নিয়ে পলাইলে।
হায়! অভাগিনী বেহুলে! ১২

বিষাদ বেদনে হৃদয় দহিল
সুখের কল্পনা কোথা মিলাইল?
শিরে করাঘাত কাতরে হানিলে,
তুমি শোকাকুলা বেহুলে। ১৩

চারিদিক শূন্য, শূন্য এ অবনী
দুখেতে আচ্ছন্ন শোকে উন্মাদিনী;
বুকে লয়ে পতি চরণ রাতুলে,
মূরছি পড়িলে বেহুলে। ১৪

হায়, ভগবান কি ভালে লিখিলে?
বিবাহ বাসরে পতিরে হরালে?
অদৃষ্টকে নিন্দি কত যে কাঁদিলে,
লৌহের বাসরে বেহুলে। ১৫

সতীর বিলাপে ধরণী কাঁপিল,
কালকূট নাগ তরাসে লুকাল,
(বুঝি) সতী ক্রোধানলে পৃথিবী দহিলে,
অয়ি তেজস্বিনী বেহুলে। ১৬

হৃদয় দেবতা।

জয় সর্ব্বেশ্বর, তুমি বিশ্বময়,
অগতির গতি,
তোমার চরণে, ভক্তিযুক্ত প্রাণে,
অসংখ্য প্রণতি।
দয়াময় হরি, ভব-ভয়-হারি
করুণা-সাগর,
সৃজন পালন, মঙ্গল কারণ,
জয় পরমেশ্বর!
কোথা কৃপাসিন্ধু, অনাথের বন্ধু,
অনাদি মহান,
এ অভাগা দীনে, অধম সন্তানে,
কর কৃপা দান।
তব প্রেম লাগি, যেন দিবা রাতি
জাগে এ হৃদয়,
তোমার কৃপায়, যেন দিন যায়
ওহে দয়াময়।
তোমার আশীষে, থেকে ভববাসে,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যত,
করিয়ে সাধন, করি সমাপন,
জীবনের ব্রত।
জয় বিশ্বপতি, করি এ মিনতি,
তোমার চরণে,—
যখন যে ভাবে, থাকি এই ভবে,
জীবনে মরণে—
হয়ে তব দাস, করি গো নিবাস,
এ ভব ভবনে,
তোমার চরণ, নিয়ত স্মরণ
থাকে যেন মনে।
সে অন্তিমে বল, তুমিই সম্বল
প্রেমময় হরি,
শেষের সে দিনে অভয় চরণে
দিও প্রভো তরি।
নমো ভগবান, সর্ব্বশক্তিমান,
প্রভো নিরঞ্জন!
আমার হৃদয়ে, তিমির নাশিয়ে,
এস নারায়ণ।

শ্রীমনোরমা রায়।
পুকুড়া, ময়মনসিংহ।

পরলোক

পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর,
প্রেরিয়াছি প্রাণসম সুহৃদ প্রচুর।
তোমার কৌমুদীময় শান্ত স্বর্গলোকে,
হেরিয়া তাদের মুখ ভুলি সব শোকে।
এ আনন্দে মন মম হয় ভরপুর,—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।
মিষ্ট আলাপন হবে তাহাদের সনে,
হাসিব কাঁদিব কত সুখ সম্মিলনে।
পূর্ব্ব স্মৃতি কত শত জাগি উঠি যত
দিবে যে আনন্দ মোরে শত মনোমত।
মন্দাকিনী তীরে হবে মিলন মধুর—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।
জুড়ায়ে হৃদয় ব্যথা বহে সমীরণ
শশাঙ্কের হ্রাস বৃদ্ধি না হয় কখন।
যেতে সেই স্বপ্নরাজ্যে মন তৃষাতুর—
পরলোক তোমারে না ভাবি আমি দূর।

শ্রীমতী হে—ক—দেবী।

বন্দনা।

অনন্ত করুণাময়
জগত-জীবন,
বন্দনা করিছে বিশ্ব
যুগল চরণ'
নীলাকাশে রবি শশী
তারকা নিকর
তোমারি মহিমা গায়
আনন্দ অন্তর।
জল, স্থল, শূন্য, আর
অনল, বাতাস,
করিতেছে কত তব
মহিমা প্রকাশ।
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, পশু
নানা জীবদল
বন্দনা করিছে তব
চরণ যুগল।
নদ নদী পারাবার
কান্তার প্রান্তর
তোমার মহিমা গায়,
মীন সরোবর।
শ্যামল বিটপীশ্রেণী
শস্যাবলি করি
গায় তব পুণ্য নাম
দিবা বিভাবরী।
ফুলে ফুলে বসি সুখে
ভ্রমর গুঞ্জরে,
তোমার গমা[illegible]
মুখে মধু ঝরে।
কুলকুল্ কল্লোলিনী
তব নাম গায়,
বিহগ তোমারি গানে
ভুবন মাতায়।
জগতের নর নারী
আনন্দিত মন,
নিয়ত তোমারি পদে
ঢালি প্রাণ মন,
ভক্তি ভরে প্রেম ফুলে
পূজে অনিবার,
প্রণিপাত করে বিভো
চরণে তোমার।

শ্রীমনোরমা রায়।
পূরুড়া, ময়মনসিংহ।

---

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ
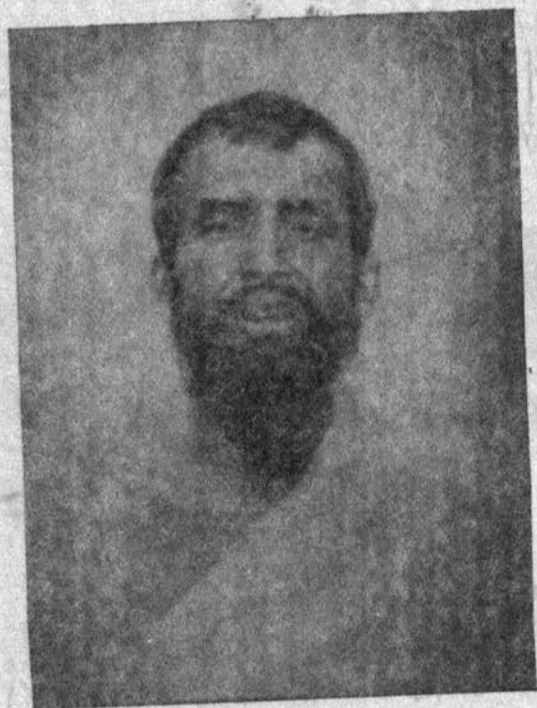
বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 617. January 1915.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫২ বর্ষ। ৬১৭ সংখ্যা। | পৌষ, ১৩২১। জানুয়ারী, ১৯১৫। | ১০ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সমাজে রমণীর স্থান।

প্রকৃতির মধ্য দিয়া বিশ্বের শক্তি বিকশিত ও প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রকৃতির দুইটি উৎস, একটি বিশ্ব-প্রকৃতি অথবা জড়-প্রকৃতি,—আর একটি আদ্যা প্রকৃতি। এই উভয় প্রকৃতি বিশ্বের মধ্যে যে এক অদ্ভুত রহস্য-জাল বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, যুগে যুগে কত কবির ধ্যান, দার্শনিকের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধান তাহা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভিতরের প্রকৃত সত্যটী যে কোন কালে ধরা পড়ে নাই তাহা নহে, তাহা অনেক বারই ধরা পড়িয়াছে। প্রত্যেক যুগের সাধক তাঁহার সাধনার মধ্যে সেই সত্য পাইয়াছেন এবং বিশ্বমানবকে তাহা দান করিয়াছেন। কিন্তু সাধকের সাধনাকে নিজের জীবনে সত্যরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে ব্যক্তিগত সাধনার প্রয়োজন, তাই পৃথিবীতে এত সাধুপুরুষ থাকিতেও পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই অসাধু। সেই জন্যই প্রত্যেক নব যুগকে নূতন করিয়া তাহার সাধনপথ খুঁজিয়া লইতে হয়। শক্তিকে আয়ত্ত করিবার এই যে চেষ্টা ইহা কতকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না, কতকাল চলিবে তাহাও কেহ বলিতে পারে না। শক্তির একটা বিশেষত্ব এই যে তাহাকে সংযত করিতে না পারিলে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করে। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—উহা তেমন জিনিসই নয়, সুতরাং সৃষ্টি করিতে না পারিলে তাহা ধ্বংস করিতে আরম্ভ করে। সৃষ্টি ও ধ্বংস একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ।

উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত করিতে মানুষ যত চেষ্টা করিয়াছে সমাজগঠনকে তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিলে অত্যুক্তি হয় না।